Muhammad Ali'র লেকচার অবলম্বনে

চলো পল্টাই

অনুবাদ তারেক আবদুল্লাহ

সম্পাদনা আশিক আরমান নিলয়

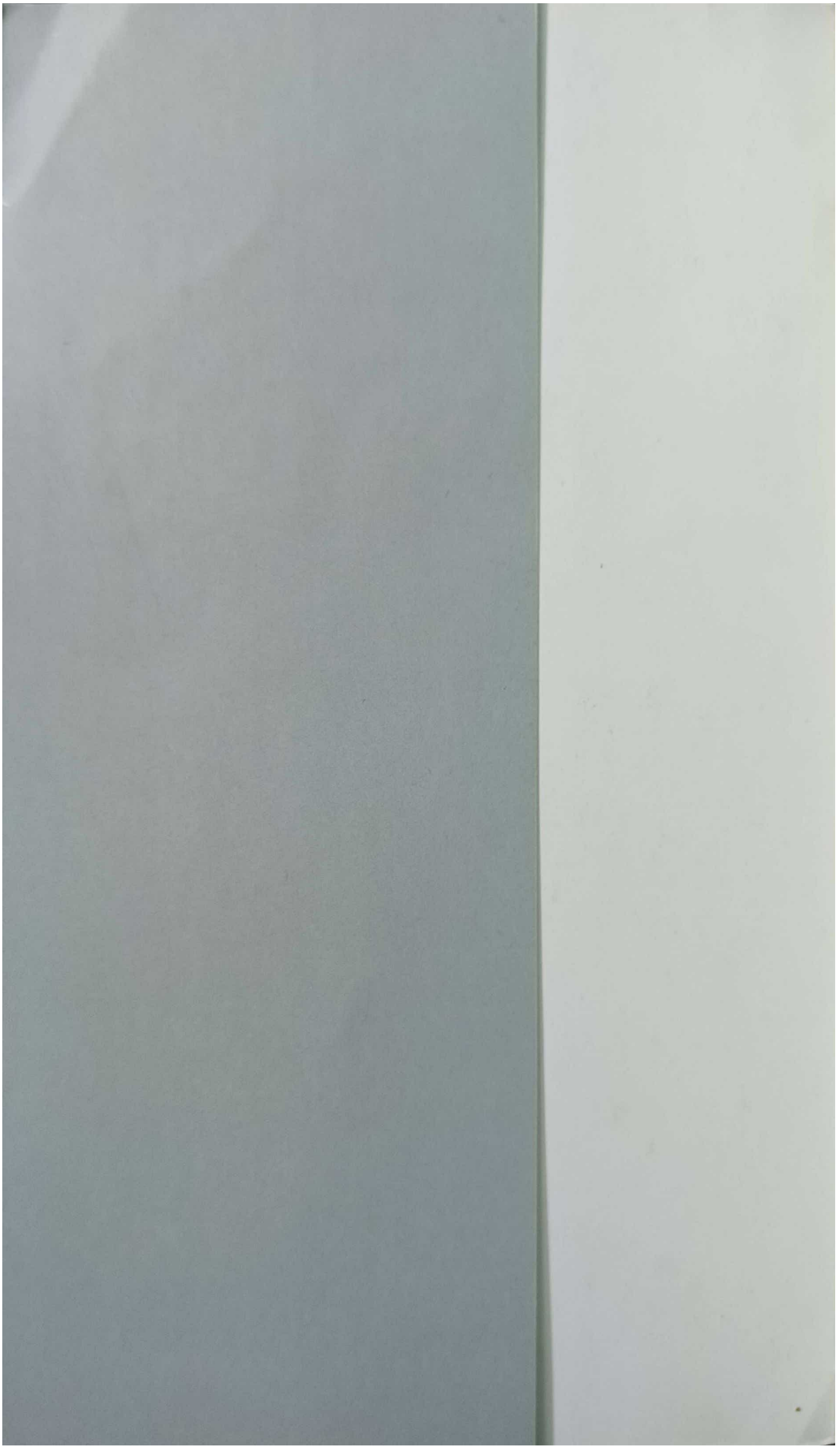

চলো পাল্টাই

ইসলামিক বিভিন্ন বিষয়ের বইয়ের পিডিএফ পেতে নিচের লিংকে ক্লিক করে আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলে যুক্ত হোন

https://t.me/islaMic_fdf

চলো পালটাই

Muhammad Ali 'র লেকচার অবলম্বনে

অনুবাদ
তারেক আব্দুল্লাহ

সম্পাদনা ও পরিমার্জন
আশিক আরমান নিলয়

BOOKMARK
PUBLICATION

চলো পাল্টাই

গ্রন্থস্বত্ব ©সাজিদ ইসলাম

প্রথম প্রকাশ: একুশে বইমেলা, ২০২৩

ISBN: 978-984-97115-0-6

বুকমার্ক পাবলিকেশন

৩৮/৩ বাংলাবাজার, বুকস এন্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স মার্কেট, ঢাকা-১১০০

ফোন : ০১৭৮৯-১৪২৪৬১

একুশে বইমেলা পরিবেশক

প্রজন্ম পাবলিকেশন

www.facebook.com/bookmarkpublication

Email: bookmark2019@yahoo.com

অনলাইন পরিবেশক

rokomari.com

wafilife.com

প্রচ্ছদ : আবুল ফাতাহ, খাদিজা তুল সাঈদা সিমু

পৃষ্ঠাসজ্জা: সাজিদ ইসলাম

মূল্য: ২০০ ৳

.....

Cholo Paltai Based on Muhammad Ali's Lectures, Translated By Tareq Abdullah, Edited By Ashiq Arman Niloy, Published By Bookmark Publication, Dhaka, Bangladesh.

“যারা আমার পথে সাধনায় আত্মনিয়োগ করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথে পরিচালিত করব। নিশ্চয় আল্লাহ সৎকর্মপরায়ণদের সাথে আছেন।”

(সূরাহ আনকাবুত, ২৯:৬৯)

আমরা অস্থির একটা সময়ে বসবাস করছি। বস্তুবাদের চোখ ধাঁধানো আলো, প্রযুক্তির নিয়ন্ত্রণে মানুষের জীবনটা গিনিপিগের মতো হয়ে গেছে। প্রতিনিয়তই তাকে নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট হচ্ছে। সে হাসছে, কাঁদছে, নাচছে—সবই যেন অন্য কারো ঠিক করে দেওয়া নিয়মে, অন্য কারো ইশারায়। তার জীবনের কোনো উদ্দেশ্য নেই, সে এসব নিয়ে ভাবেও না, কিংবা তাকে ভাববার ফুসরত দেয়া হয় না।

একটা অস্থির, লক্ষ্য-উদ্দেশ্যহীন, ভঙ্গুর প্রজন্ম আমাদের চোখের সামনে বড় হচ্ছে। এরা জীবনের অর্থ কী জানে না। পরীক্ষায় ভালো করতে না পেরে, পেমিক-প্রেমিকার কাছে ফেসবুকে ব্লক খেয়ে, মায়ের বকুনি খেয়ে এরা আত্মহত্যা করে বসে। এরা জীবনের মূল্য বোঝে না। নিজের মূল্য বোঝে না। এরা পরিবর্তনকে মনে করে বোঝা। এরা অন্যকে দেখে, অন্যের মতো হতে চেয়ে, অন্যের সাথে নিজেকে তুলনা করে বাঁচে। কিন্তু এ তো বেঁচে থাকা নয়। আমাদের জীবনটা তো এত সস্তা নয়।

তাই চলো পাল্টাই। একটু বসি। একটু ভাবি। নিজেকে একটু সময় দিই। শুরুটা আজই হোক, এখনই...

সাজিদ ইসলাম

প্রকাশক, বুকমার্ক পাবলিকেশন।

সূচি

জীবনের ফালসাফা/ ৯

চলো পাল্টাই/ ১৯

সুখের সন্ধানে/ ২৯

ডিপ্রেশন/ ৪১

একটি ছোট্ট অনুরোধ/ ৫০

ডোপামিনের দুনিয়ায়/ ৫৩

ইসলাম ও মননশীলতা/ ৬৩

তাজকিয়ায়ে নফস/ ৭৪

স্ক্রিন আসক্তি/ ৮৮

দুঃখবোধ/ ৯৬

হুট করে কেন মন খারাপ হয়?/ ১১৪

আপনার শত্রুকে চিনুন/ ১১৭

পেয়ার, ইশক ঔর মোহাব্বাত/ ১২৮

এক একটা মৃত্যু এসে মনে করিয়ে দেয়, এই পৃথিবী আসলে আমাদের নয়। শুধু আরশের অধিপতি সত্য, চিরঞ্জীব। আমাদের সবার যাত্রা তাঁর দিকেই। কত কঠিন সেই সাক্ষাতের দিন। অথচ কত নিশ্চিন্ত আমাদের বেঁচে থাকা।

এখনও সময় আছে। চলো পাল্টাই...

জীবনের ফালসাফা

আমরা অনেকেই জানি না আমাদের জীবনের ফিলোসোফি কী। জীবনটা কীভাবে কাটাতে হবে? আমাদের রব আমাদের কাছ থেকে কী চাচ্ছেন এবং কীভাবে আমরা জীবনে সামনে এগোবো? জীবনের ব্যাপারে আমাদের মাথায় কী কী চিন্তা-ভাবনা থাকা উচিত এবং জীবনের চ্যালেঞ্জ গুলো কী কী? তাই যতক্ষণ না জীবনের প্রকৃত রূপ সম্পর্কে আমরা জানতে পারবো, ততক্ষণ পর্যন্ত জীবনকে প্রোডাক্টিভভাবে যাপন করা আমাদের জন্য অনেক কঠিন হয়ে যাবে।

ছোটবেলা থেকে আমরা যে মুভি, গান দেখে আসছি, এগুলো আমাদেরকে জীবন সম্পর্কে কী ধারণা দিয়ে এসেছে? সেটা হচ্ছে YOLO, মানে You only Live Once। যে মুভি, গানগুলো আমরা দেখে এসেছি, সেগুলো আমাদেরকে এটাই বলছে যে দুনিয়াতে আমরা শুধু পার্টি, আনন্দ করতে এসেছি। খাওয়া-দাওয়া আর ফুর্তি করার জন্য এসেছি।

প্রথমে প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনা, তারপর প্রফেশনাল লাইফে প্রবেশ। তারপরে কিছুটা সেটেল হলে বিয়ে-শাদী আর বাচ্চাকাচ্চা। তারপর নিজের ক্যারিয়ার আর অ্যাম্বিশানের পেছনে ছুটতে ছুটতেই ছেলেমেয়েদেরও সেই একই চক্রে প্রবেশের সবক শেখাতে থাকা। এইভাবেই বেশিরভাগ মানুষ তাদের সারাজীবন কাটিয়ে দেয়। তারপর একদিন হুট করে মারা যায়। এটাকেই আমরা জীবন বলি। এই যে জীবনের ফালসাফা (ফিলোসফি), এটা কি আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে বলেছেন? নাকি আমরা নিজেরা বানিয়েছি? নাকি কোনো মুভি বা গান থেকে নিয়েছি?

এ প্রশ্ন আমাদের নিজেরা নিজেদেরকে করা উচিত। কারণ অধিকাংশ লোকই জীবনের শেষে আফসোস করে। কারণ তারা ভাবে তারা জীবনটা ঠিকভাবে

কাটায়নি। আক্ষেপ করে "ইশশ ... যদি আমি জীবনে ওই অমুক কাজটি করতাম, তাহলে আরো ভালো হতো।"

ইন্টারনেটের কিছু কিছু শিরোনামের আর্টিকেল আমার চোখে পড়ে যেমন Do these 10 things before you die বা Travel these 20 places before you die. এই কথাগুলো তখনই সঠিক হতো, যদি মৃত্যুপরবর্তী জীবন বলে কোনোকিছু না থাকত। মুসলিমদের কাছে জীবন মানেই হচ্ছে জান্নাত এবং সেখানে যাওয়াই আমাদের পার্থিব জীবনের মূল লক্ষ্য। এখানে দেশের সংখ্যা তো মোটে দুইশো, কিন্তু জান্নাতে ঘোরার জন্য না জানি কত জায়গা থাকবে।

কোনো জায়গায় ঘুরতে যাওয়া বা দেখতে যাওয়া সমস্যা না। কিন্তু ওইসব আর্টিকেল আপনাকে শুধু ঘুরতে যাওয়ার দশটা জায়গা বা খাওয়ার মতো দশটা রেসিপি জানিয়েই ক্ষান্ত হচ্ছে না। সেগুলোর পেছনে বহন করছে একটি জীবনদর্শন। সেই দর্শনটা হলো: দুনিয়ার জীবনটাই একমাত্র জীবন। তারপরে আপনি মাটি হয়ে যাবেন, সবকিছু শেষ হয়ে যাবে। হয়তো সে জন্যই আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি হয়ে গেছে পার্থিব জীবন থেকে ম্যাক্সিমাম ফায়দা নেওয়া। যে আসল কাজ করার জন্য আমরা দুনিয়াতে এসেছিলাম, সেটা আমরা করছি না।

আল্লাহ আমাদের জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। তাই হাজারটা দুনিয়া পেলেও মনটা তৃপ্তি পায় না। ফলে একটা মানুষ সেই ভিডিওগুলোর কথামতো ওই ১০টা কাজ করে ফেললে বা ২০টা জায়গা থেকে ঘুরে আসলেও মৃত্যুর সময় আফসোস করে। ভাবে নতুন আরো ২০টা জায়গায় ঘুরতে পারলে জীবনটা পূর্ণতা পেত। কোনো অলৌকিক বলে সে যদি আরো ২০ বছর আয়ু পেয়ে ওই জায়গাগুলোও ঘুরে আসে, তাতে সেই অপূর্ণতা এক চুলও কমবে না।

কেউ যদি আপনাকে বলে জীবনের ফালসাফা কী। তাহলে তাকে এই হাদীসটি শুনিয়ে দেবেন। যদি দুনিয়ার সব দার্শনিক, কবি, সাইকোলজিস্ট এক হয়ে "জীবনের ফালসাফা কী?" প্রশ্নটির উত্তর দিতে চায়, সবাই মিলে জীবন সম্পর্কে বেস্ট ফর্মুলা তৈরি করার চেষ্টা করে, তখনও তারা এই ফিলোসফি বলতে পারবে না যেটা এই হাদীসে বলা হয়েছে:

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত,

> "একদিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি চতুর্ভূজ আঁকলেন এবং এর মাঝখানে একটি রেখা টানলেন, যেটি চতুর্ভুজের বাইরে চলে

গেল। তারপর দুপাশ দিয়ে মাঝের রেখার সাথে ভেতরের দিকে কয়েকটা ছোট ছোট রেখা মেলালেন এবং বললেন, 'এ মাঝামাঝি রেখাটা হলো মানুষ। আর চতুর্ভুজটি তার মৃত্যু, যা তাকে ঘিরে রেখেছে। আর বাইরের দিকে বর্ধিত রেখাটি তার আশা-আকাঙ্ক্ষা। আর ছোট ছোট রেখাগুলো নানা রকম বিপদাপদ। যদি সে এর একটাকে এড়িয়ে যায়, তবে অন্যটা তাকে আক্রমণ করে। আর অন্যটাকেও যদি এড়িয়ে যায়, তবে পরবর্তী অন্য একটি তাকে আক্রমণ করে।"[১]

যদি এটাকে ডায়াগ্রাম আকারে দেখানো হয়, তাহলে এটা দেখতে এরকম হবে।

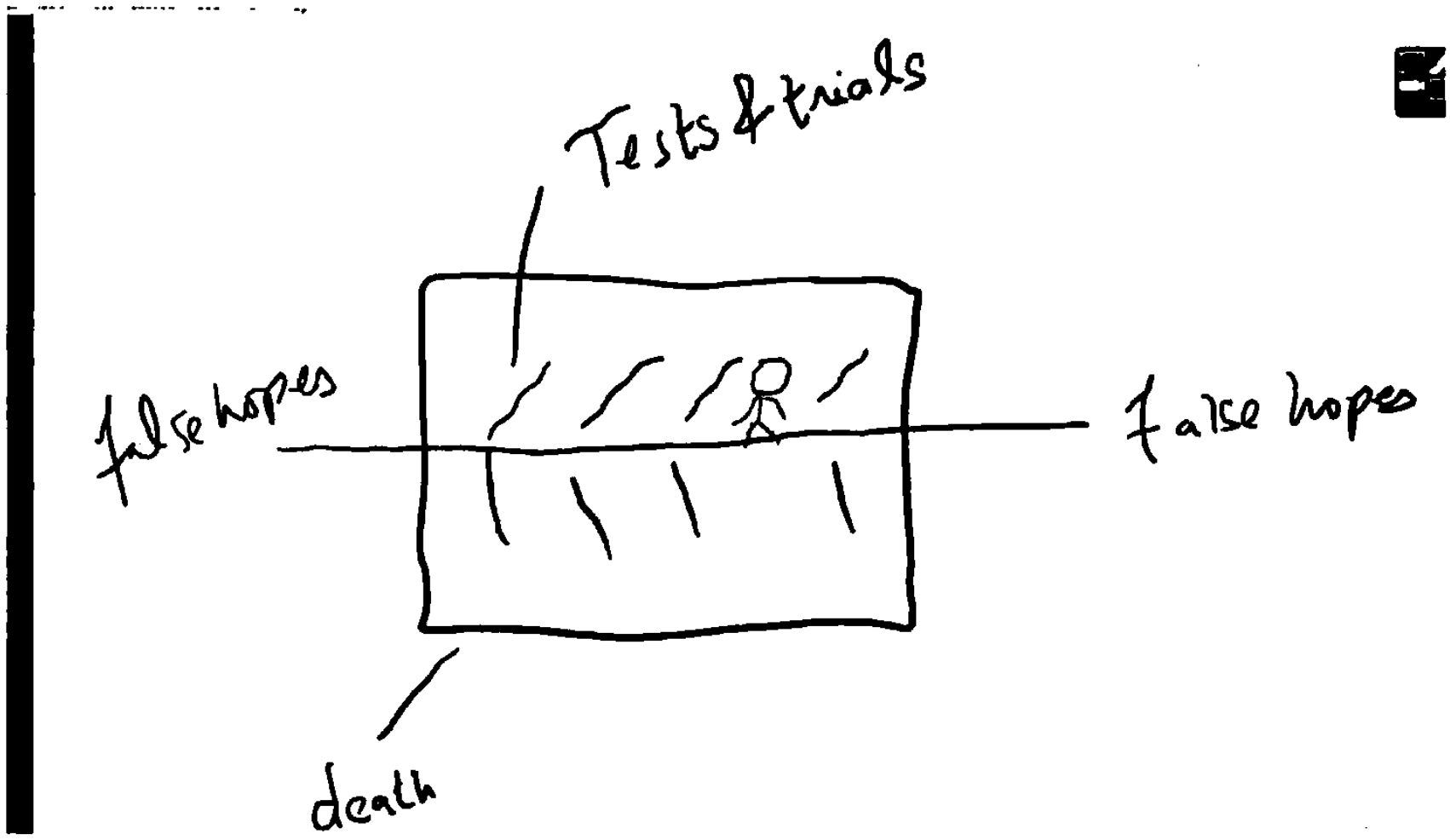

মানুষের পুরো জীবনকে সুন্দরভাবে একটি চিত্রের মাধ্যমে তুলে তুলে ধরা হয়েছে। ইসলামিক ফিলোসফি অনুযায়ী প্রথম কথাই হচ্ছে, আমাদেরকে অবশ্যই মৃত্যুবরণ করতে হবে। কেউই অনন্তকাল বেঁচে থাকবে না। নিজেকে অমর মনে করে, এমন কেউ তো নেই।

যে মনে করে মৃত্যু শুধু তার বৃদ্ধকালেই আসবে, সে ধোঁকায় পড়ে আছে।

---

[১] সহীহ বুখারি : ৬৪১৭

যে মনে করে মৃত্যুর পরে কোনো হিসাব নিকাশ হবে না, সেও ধোঁকায় পড়ে আছে।

যে মনে করে সে দুনিয়াতে যা ইচ্ছা তা-ই করতে পারে এবং সে জন্য তাকে কোনো জবাব দিতে হবে না, সেও ধোঁকায় আছে।

যে মনে করে সে কোনো দায়িত্ব, উদ্দেশ্য ছাড়াই তার জীবন কাটিয়ে দেবে আর তাতে তার কোনো লোকসান হবে না সেও ধোঁকায় পড়ে আছে।

যে মনে করে আমরা যত খুশি গুনাহ করতে পারি আর আল্লাহ তো রহমান ও রহিম, তিনি অবশ্যই আমাদের মাফ করে দেবেন, সেও ধোঁকায় পড়ে আছে।

তো আল্লাহ এবং তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছেন যে আমাদের জীবনে অবশ্যই বিপদাপদ, পরীক্ষা আসবেই। Life is full of test & trails । এগুলো আসতেই থাকবে।

وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ

> “এবং অবশ্যই আমি তোমাদিগকে পরীক্ষা করব কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, মাল ও জানের ক্ষতি ও ফল-ফসল বিনষ্টের মাধ্যমে। তবে সুসংবাদ দাও সবরকারীদের।” (সূরাহ বাকারা, ২: ১৫৫)

সে পরীক্ষা আত্মীয়স্বজনদের পক্ষ থেকে হতে পারে বা নিজেদের সন্তানদের পক্ষ থেকে হতে পারে, বাবা-মার পক্ষ থেকে হতে পারে। অপরের অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণ, সম্পদের ক্ষতি, এইম ইন লাইফ অর্জন করতে না পারা, পছন্দের কাউকে বিয়ে করতে না পারা, সবই একেকটা পরীক্ষা। কারো অনেক শত্রু থাকে, আবার কারো কাছে কোনো টাকা-পয়সা থাকে না। আবার কারো কাছে অনেক টাকা পয়সা থাকে কিন্তু অন্তরে কোনো শান্তি থাকে না। তাই আমাদের সবাইকেই বিভিন্নভাবে পরীক্ষা করা হচ্ছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই ওয়া সালাম কী সুন্দরভাবে বিষয়টি বুঝিয়েছেন!

জীবনে বিপদাপদ কামনা করবেন না। কিন্তু বিপদ চলে এলে হতাশও হবেন না। প্রস্তুত থাকবেন, প্রতিরোধ ও প্রতিকার করার চেষ্টা করবেন। আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করবেন

رَبَّنَآ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ

"হে পরওয়ারদেগার! আমাদেরকে দুনয়াতেও কল্যাণ দান কর এবং আখেরাতেও কল্যাণ দান কর এবং আমাদেরকে দোযখের আযাব থেকে রক্ষা কর।"

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আঁকা চিত্রে যে লাইনটা চতুর্ভুজের বাইরে চলে গেছে, সেটা হচ্ছে মানুষের মিথ্যা আশা। এগুলো মানুষের জীবনের ধরাছোঁয়ার বাইরে। মানুষ মনে মনে এমন অনেক কিছু চায় বা আশা করে, যেটা আসলে বাস্তবে পাওয়াটা সম্ভব না। এই মিথ্যা আশার পিছনে ছুটে জীবনটা অতিবাহিত করে সে। যতই ছোটে, ততই সে আসলে মৃত্যুর মুখোমুখি হতে থাকে। অথচ সেদিকে তার খেয়ালই থাকে না। তারপর এক না একসময় সেই মানুষটা মৃত্যুর মুখোমুখি এসে দাঁড়ায়। মৃত্যুর সময় ফেরেশতারা যখন রূহ কবজ করার জন্য আসে, তখন সে জীবনের কৃতকর্মের জন্য আফসোস করতে থাকে। তারপর কবরে গিয়েই আপনার চোখ খুলবে। যেমনটা আল্লাহ তা'আলা কুরআনে বলেছেন:

أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ
حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ
كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ

"প্রাচুর্যের লালসা তোমাদেরকে গাফেল রাখে, এমনকি, তোমরা কবরস্থানে পৌঁছে যাও। এটা কখনও উচিত নয়। তোমরা সত্ত্বরই জেনে নেবে।" (সূরাহ তাকাসুর, ১০২:১-৩)

কবর গিয়েই সে বুঝতে পারবে, "আমার জীবনের প্রায়োরিটিগুলো ভুল ছিল এবং আমি ভুল ফালসাফায় জীবনটা কাটিয়েছি। আমি তো ভেবেছিলাম জীবন একটাই। কোনো জান্নাত জাহান্নাম নেই, যা কামাই করার এখানেই কামাই করে নেই। এই সবকিছু কামানোর দৌড়ে, ক্যারিয়ার বানানোর দৌড়ে, নিজের পরিবারের সকলকে ভুলে গেছি, নামাজকে ভুলে গেছি, আখিরাতকে ভুলে গেছি, এ পৃথিবীতে আসার আগে আল্লাহকে যে ওয়াদা দিয়েছি সেটাও ভুলে গেছি।"

ছোটবেলা হাসি-মজা করা, যৌবনে ক্যারিয়ার গড়া, বাচ্চাকাচ্চা পয়দা করা, তারপর তাদেরকে বড় করার একটা দৌড়ে লেগে যাওয়া, ছেলেমেয়েদের জন্য যত বেশি সম্ভব অর্থসম্পদ তৈরি করে রেখে যাওয়া – এ সবই বৈধ, যদি এগুলো

আমাদের জীবনের সেকেন্ড প্রায়োরিটি হয়। প্রথম প্রায়োরিটি হতে হবে আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মান্য করা। এগুলো ঠিক রেখে বাকিগুলো করা গেলে তো সোনায় সোহাগা!

হাদিসে বলা হয়েছে পৃথিবীতে মুসাফিরের মতো থাকতে। এর মানে গরিব হয়ে থাকা নয়। এর মানে হচ্ছে নিজের প্রায়োরিটিগুলো ঠিক করে নেওয়া। এই বিষয়টিই জীবনের চলার পথে সব সময় মনে রাখা উচিত।

উদাহরণস্বরূপ, রমজানে মজার মজার ইফতারি আইটেম আর ঈদের প্ল্যানিং অবশ্যই করবেন। কিন্তু সেকেন্ড প্রায়োরিটি হিসেবে। প্রথম প্রায়োরিটি হবে কিছুক্ষণ বসে প্ল্যানিং করা যে, কী কী আমল করব। রাতে কী কী ইবাদাত কীভাবে করব। কুরআন কখন পড়বো, কখন নফল নামাজ আদায় করবো, কত টাকা সাদাকা করব ইত্যাদি।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

> "তোমরা (অযথা) পার্থিব সম্পদ গ্রহণ করো না। কেননা, এর দ্বারা তোমরা দুনিয়ার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়বে।"[২]

দুনিয়ার প্রতি আকর্ষণ থাকবেই। সমস্যা হচ্ছে আসক্তিতে। নামাজির মনেও দুনিয়ার প্রতি স্বভাবজাত আকর্ষণ থাকে। কিন্তু যার না নামাজ পড়ার সময় হয়, না দান সাদাকা করার সময় হয়, না দ্বীন বোঝার সময় হয়, না বাবা-মার খোঁজ নেয়ার সময় থাকে, সে দুনিয়ার প্রতি আসক্ত।

কবরের পরে কোথায় যেতে হবে? আখিরাতে। অনন্ত অসীম সময় ধরে সেখানে থাকতে হবে। যে জীবনের শুরু আছে, কিন্তু শেষ নেই। তাই জ্ঞান, বিবেকবুদ্ধি ওয়ালা মানুষ কী চিন্তা করবে?

এই প্রসঙ্গে কিছু হাদীস উল্লেখ করছি। এই হাদীস এতটাই সুন্দর যে, এগুলোকে আপনার জীবনের নিয়ম বানিয়ে নিন। এই হাদীসগুলোর উপর আমল করার চেষ্টা করুন। দেখবেন আপনার জীবন অনেক সুন্দর হয়ে যাবে, টেনশন ফ্রি হয়ে যাবেন।

---

[২] তিরমিজি : ২৩২৮

উবায়দুল্লাহ বিন মিহসান আল-আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

> "যে ব্যক্তি সুস্থদেহে দিনাতিপাত করে, পরিবার-পরিজনসহ নিরাপদে সকালে উপনীত হয় এবং তার নিকট যদি সারা দিনের খোরাকী থাকে, তাহলে সে যেন গোটা দুনিয়াই পেয়ে গেল।"[৩]

আমরা বিশ পঁচিশ বছরের প্ল্যান আগে থেকেই করে রাখি। যখন বাচ্চাকাচ্চা হবে, তাদেরকে কোত্থেকে খাওয়াবো। কোন স্কুলে ভর্তি করাবো, তাদের ফিস কোত্থেকে আসবে। যেখানে আমরা আল্লাহর নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করার দরকার ছিল, সেখানে আমরা ভয় পাই বাচ্চা হলে কোত্থেকে খাওয়াবো। আর অন্যদিকে সেক্যুলার দৃষ্টিভঙ্গি তো আছেই যে দুটি বাচ্চা হলে ভালো হয়। তাই শোকরগুজার করুন। আজকে তো খাওয়ার জন্য কিছু মজুদ আছে। কালকে নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা রিজিক দেবেন। যেভাবে আল্লাহ তা'আলা পাখিদের রিজিক দেন। এই লেখা যারা পড়ছেন তাদের সাথে কি কখনো এরকম হয়েছিল যে, কোনোদিন খাওয়ার জন্য একেবারে কিছুই ছিল না? সারাদিন অভুক্ত হয়ে ছিলেন বা না খেয়ে মরতে বসেছিলেন, এমনকি কখনো হয়েছে?

আল্লাহ তা'আলা কুরআনে বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

> "হে ঈমানদারগণ! ধৈর্য ধারণ কর এবং মোকাবেলায় দৃঢ়তা অবলম্বন কর। আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক যাতে তোমরা তোমাদের উদ্দেশ্য লাভে সমর্থ হতে পার।" (সূরাহ আলে ইমরান, ৩ : ২০০)

সব সময় ধৈর্য ধরুন এবং আল্লাহকে ভয় করে জীবন যাপন করুন। সুসংবাদ তাদের জন্য যারা কঠিন সময়ে আল্লাহকে স্মরণ করেছে এবং এই কষ্ট সহ্য করেছে। মুখ দিয়ে কখনো অকৃতজ্ঞতা বের হয়নি। আল্লাহ তা'আলা যা দিয়েছেন, তাতেই সন্তুষ্ট থেকেছে।

---

[৩] ইবনে মাজাহ: ৪১৪১

আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেন,

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ

"(হে বিশ্বাসীগণ!) আমি অবশ্যই পরীক্ষা করব, যতক্ষণ পর্যন্ত পরিষ্কার বোঝা না যায় যে, তোমাদের মধ্যে কে কে জেহাদ করে ও প্রতিকূলতার মুখে ধৈর্যধারণ করে। তোমাদের (বিশ্বাসের ব্যাপারে সকল দাবির সত্যতা) আমি অবশ্যই পরীক্ষা করে দেখব।" (সূরাহ মুহাম্মদ, ৪৭: ৩১)

বালা-মুসীবত আল্লাহর সাথে বান্দার দূরত্ব কমিয়ে আনে। কারণ বালা-মুসীবত এলে বান্দা আল্লাহর স্মরণ বাড়িয়ে দেয়। আল্লাহর সাহায্য কামনা করতে থাকে। তাই বান্দা যখন আল্লাহর স্মরণবিচ্যুত হয়ে দূরে চলে যায়, আল্লাহ তা'আলা তখন ঐ বান্দাকে কাছে নেয়ার জন্য বিপদ দেন। আল্লাহ তা'আলা চান, তাঁর পছন্দীয় বান্দারা তাঁর নিকটে থাকুক। তাঁর জিকির ও ইবাদতের মধ্যে মশগুল থাকুক। আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে যে যতো বেশি মর্যাদাবান, তার পরীক্ষাও ততো বেশি।

আবু ইয়াহয়া সুহাইব ইবনে সিনান রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

"মুমিনের ব্যাপারটাই আশ্চর্যজনক। তার প্রতিটি কাজে তার জন্য মঙ্গল রয়েছে। এটা মু'মিন ব্যতীত অন্য কারো জন্য নয়। সুখ এলে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। ফলে এটা তার জন্য মঙ্গলময় হয়। আর কষ্ট পেলে ধৈর্য ধারণ করে। ফলে এটাও তার জন্য মঙ্গলময় হয়।"[৪]

মুমিনের জীবনে ভালো-মন্দ যা কিছু ঘটুক না কেন, বিশ্বাস করতে হবে অবশ্যই তাতে কল্যাণ নিহিত রয়েছে। বিপদাপদে যদি আমরা ধৈর্যের পরিচয় দিতে পারি তাহলে আল্লাহ আমাদের গুনাহ মোচন করেন, আখিরাতে মর্যাদা বৃদ্ধি করেন এবং এই কষ্ট ও বিপদ-মুসিবতের উত্তম বিনিময় দান করেন।

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "মুমিন নর-নারীর জান, মাল ও সন্তানের উপর বিপদ-আপদ আসতেই থাকে। অবশেষ আল্লাহর সাথে সে সাক্ষাৎ করে এমন অবস্থায় যে, তার আর কোনো গুনাহ থাকে না।"

---

[৪] মুসলিম ২৯৯৯, আহমাদ ১৮৪৫৫, ১৮৪৬০, ২৩৪০৬, ২৩৪১২, দারেমী ২৭৭৭

তাই সবর বা ধৈর্য ধারণ করা আকীদার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। জীবনে বিপদ-মুসিবত নেমে আসলে অস্থিরতা প্রকাশ করা যাবে না। বরং ধৈর্য ধারণ করতে হবে। পাশাপাশি আল্লাহর নিকট প্রতিদান পাওয়ার আশা করতে হবে। সুতরাং, বিপদে পড়লে আমাদের এই বিশ্বাস রাখা জরুরি, "আমি পাপী হলেও আল্লাহ আমাকে ভালোবাসেন। আর এই জন্য আমাকে বিপদে ফেলে আমাকে সংশোধিত করছেন, যাতে করে পরকালে যা আমদের আসল ঠিকানা, সেখানে আমাদেরকে অনন্ত সুখের জীবন দান করেন।"

আরেকটি দোয়া আছে যেটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেক ফরজ নামাযে পড়তে বলেছেন,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ، وَأَعوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ

আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'উযু বিকা মিনাল বুখলি, ওয়া 'আউযু বিকা মিনাল জুবনি, ওয়া আ'উযু বিকা মিন আন উরাদ্দা ইলা আরযালিল্ 'উমুরি, ওয়া আ'ঊযু বিকা মিন্ ফিতনাতিদ দুনইয়া ও আযা-বিল ক্বাবরি।

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকটে আশ্রয় চাই কৃপণতা, কাপুরুষতা থেকে ও আশ্রয় চাই চরম বার্ধক্যে উপনীত হয়ে যাওয়ার এবং আপনার নিকট আশ্রয় চাই পৃথিবীর ফিতনা থেকে ও কবরের আযাব হতে।[৫]

প্রত্যেক ফরজ নামাযের শেষে এই দোয়াটি পড়ুন। দেখবেন আপনার জীবনে অনেক বরকত নেমে আসবে এবং অনেক ফিতনা থেকে আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে ওইভাবে জীবন অতিবাহিত করার তৌফিক দান করুন, যেভাবে আল্লাহ এবং তার নবী রাসূল সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন। ভুল ফালসাফায় যেন আমাদের সময় কেটে না যায়।

শেষ কথা

একটি গল্প দিয়ে লেখাটা শেষ করছি। তিন বন্ধু ছিল যারা একটা হোটেলের ৭৫ তলায় তিনটি রুম নিয়েছিল। হোটেলের নিয়ম এরকম ছিল যে, দশটার পর যদি আসেন, তাহলে লিফট বন্ধ হয়ে যাবে। তখন আপনাকে সিঁড়ি দিয়ে আপনার রুমে যেতে হবে। একদিন তিন বন্ধুরই আসতে দেরি হয়ে গেল। এখন যেহেতু তাদের

---

[৫] বুখারী, (ফাতহুল বারীসহ) ৬/৩৫, নং ২৮২২ ও নং ৬৩৯০

সিঁড়ি দিয়ে যাওয়া লাগবে, তাই তিন বন্ধু মিলে প্ল্যান করল তারা তিনজন গল্প গুজব করতে করতে যাবে। প্রথম বন্ধু বলল সে প্রথম পঁচিশ তলা পর্যন্ত হাসি, মজার গল্প আর জোকস শোনাবে, ফলে সময় কেটে যাবে। দ্বিতীয় বন্ধু বলল সে পরবর্তী পঁচিশ তলা পর্যন্ত বিভিন্ন প্রফেশনাল টিপস এবং জীবনে চলার জন্য গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ দিবে। তৃতীয় বন্ধু বলল সে শেষ পঁচিশ তলা পর্যন্ত জীবনের বিভিন্ন দুঃখভরা কবিতা, গল্প, কাহিনী শোনাবে।

তো প্রথম বন্ধু প্রথম পঁচিশ তলা বিভিন্ন হাসি মজা করলো এবং জোকস শোনালো। প্রথম পঁচিশ তলা তারা সহজে অতিক্রম করল। তারপরে দ্বিতীয় বন্ধু বিভিন্ন লাইফ হ্যাকস, প্রফেশনাল টিপস, জীবনে কীভাবে সফল হওয়া যায়, সে বিষয়ে টিপস এবং জীবনে চলার জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ দিল। এভাবে তারা পঞ্চাশ তলা পর্যন্ত পার হয়ে গেল। এবার তৃতীয় বন্ধুটির পালা। সে মানুষের জীবনের বিভিন্ন দুঃখ ভরা কাহিনী শোনাতে লাগল। দেখতে দেখতে তারা পচাত্তরতম তলায় এসে তাদের রুমের সামনে এসে দাঁড়ালো। এখন তৃতীয় বন্ধুটি বাকি দুই বন্ধুকে বলল, "জানো! আমার জীবনের সবচেয়ে দুঃখের ঘটনা কী?" বাকি দুই বন্ধু জানতে চাইল, "কী?"

তৃতীয় বন্ধুটি বলল, "আমি চাবি নিচে ভুলে রেখে এসেছি।"

এই গল্প থেকে আমাদের জন্য শিক্ষনীয় বিষয় হচ্ছে আমাদের জীবনটা আমরা কীভাবে কাটাব, সেটা আমাদের জানতে হবে। জীবনের প্রথম পঁচিশ বছর হাসি মজা করে কাটিয়ে দিই। না দ্বীন মেনে চলি, না বাবা-মার কথা শুনি। তার পরবর্তী পঁচিশ বছর মানুষ সিরিয়াস হয়ে যায়। টাকা-পয়সা কীভাবে কামানো যায়, কীভাবে সফল হওয়া যায় সেগুলো নিয়েই সে ব্যস্ত থাকে। তার পরের পঁচিশ বছর সে দুঃখ, অনুতাপ নিয়ে জীবন কাটায়। তার অমুক ছেলে বা মেয়ে তার সাথে এমন করেছে, জীবনে ঐ রকম সুযোগ ছিল কিন্তু করতে পারে নাই ইত্যাদি। কিন্তু দরজাটা যে জিনিস দিয়ে খুলবে, সেটা আপনি শুরুতেই ভুলে এসেছেন। ছোটবেলায় আমাদেরকে যেটা শেখানো হয় নাই যে জীবনটা আমরা কীভাবে কাটাবো। সেটা হচ্ছে দ্বীনের ফালসাফা। এটাই হচ্ছে এই গল্পের মূল শিক্ষা।

চলো পাল্টাই

অনেক মানুষই নিজের মধ্যে পরিবর্তন আনতে চায়। তারা জানে সঠিক এবং ভুল কোনটি। তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং আল্লাহ তায়ালাকে অনেক ভালোবাসে। তাদের অন্তরের মধ্যে ইসলাম আছে। তারা নামাজও পড়তে চায় এবং গুনাহ ছাড়তে চায়। এই অলসতা এবং অবাধ্যতার জীবনের প্রতি তারা বিরক্ত। অনেকবার চেষ্টাও করেছে পরিবর্তন আনার। কিন্তু বারবারই ব্যর্থ হয়েছে।

তারা বারবার চেষ্টা করে, ব্যর্থ হয় এবং আবার উঠে দাঁড়ায়। ফলে এমন সময় চলে এসেছে, তারা বিরক্ত হয়ে গেছে। হ্যাঁ, পরিবর্তন আনা সহজ নয়। কিন্তু এজন্যই তো এর পুরস্কারও অনেক বেশি। নিজের ভালোর জন্যই নিজের মধ্যে পরিবর্তন আনতে হবে। নিজেকে নিজে মোটিভেট করতে হবে।

অনেকেই তাদের সর্বোচ্চ চেষ্টাটুকু করছে। তারা দ্বীন নিয়ে জানতে চায় এবং নামাজও পড়তে চায়। তারা তাদের রুটিন চেঞ্জ করতে এবং প্রোডাক্টিভ হতে চায়। কিন্তু যেকারণেই হোক, পারছে না।

তাদেরকে উদ্দেশ্য করেই আল্লাহ সূরাহ বাকারার ১৮৬ নাম্বার আয়াতে দারুণ মোটিভেশন দিয়েছেন। এই আয়াত আল্লাহ তা'আলার সাথে আপনার সম্পর্কটাই পাল্টে দেবে। শয়তান আমাদেরকে গোমরাহ করার জন্য অনেক অ্যাকটিভ থাকে। পরিবর্তিত হওয়ার জন্য মোটিভেশন, অর্থাৎ নিজের মধ্যে পরিবর্তন আনার যে তৌফিক (যেটাকে আমরা হিদায়াত বলি), নিজের ভিতর পরিবর্তন আনার যে আকাঙ্ক্ষা – এগুলো সবই আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকেই আসে। যেটা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আসে, সেটা অনেক দীর্ঘস্থায়ী, অনেক শক্তিশালী। যখন আমরা নিজেরাই আগ্রহ দেখাবো না, তখন আমরা কীভাবে নিজের মধ্যে পরিবর্তন আনবো?

এখন কথা হল আমরা এই আগ্রহ কেন দেখাই না? কারণ শয়তান কমবেশি আমাদের সবাইকে আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে Insecure করে দিয়েছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ব্যাপারে এমন এমন কথা আমাদের অন্তরে ঢুকিয়ে দিয়েছে যে, আল্লাহ থেকে আমরা দূরে সরে গেছি। আল্লাহ তা'আলার সাথে কথা বলি না, আল্লাহ তা'আলার কাছে দোয়া করি না এবং তাঁর কাছে আমাদের হাত পর্যন্ত তুলি না। আমাদের কাছে সবকিছু করার সময় থাকে, কিন্তু পাঁচ মিনিট আমরা আল্লাহ তা'আলার সাথে কথা বলি না। কী জন্য? কারণ শয়তান আমাদের মনের মধ্যে এই ধারণা বদ্ধমূল করেছে যে, আমি তো নিজেই অনেক গুনাহগার। আল্লাহ তা'আলা তো আমার কোনো কথাই শুনবেন না। আগের দোয়াগুলো কবুল করেননি। এখন কবুল করবেন?

আল্লাহ তা'আলার ব্যাপারে এমন এমন সব ওয়াসওয়াসা শয়তান আমাদের অন্তরে ঢুকিয়েছে। তারপর গুনাহের একটা পাহাড় আমাদের সামনে আসে। আমি তো দিনরাত আল্লাহকে অমান্য করে চলেছি। আমি তো নামাজও ছেড়ে দিই। আর আমি এত কবিরা গুনাহ করি যে, আমি কী কথা বলব আল্লাহর সাথে?

তাদের ব্যাপারেই আল্লাহ সূরাহ বাকারার ১৮৬ নাম্বার আয়াতে বলেছেন

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ
فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

> "আর আমার বান্দারা যখন তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে আমার ব্যাপারে, বস্তুতঃ আমি রয়েছি সন্নিকটে। যারা প্রার্থনা করে, তাদের প্রার্থনা কবুল করে নিই, যখন আমার কাছে প্রার্থনা করে। কাজেই আমার হুকুম মান্য করা এবং আমার প্রতি নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করা তাদের একান্ত কর্তব্য। যাতে তারা সৎপথে আসতে পারে।"

ওস্তাদ নোমান আলী খান এই আয়াতকে অত্যন্ত সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। এখানে "যখন" শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, "যদি" শব্দটি নয়। এই "যখন" ও "যদি" এর মধ্যে পার্থক্যটা কী? ধরুন এক মায়ের সন্তান যুদ্ধে গিয়েছে। সেই মা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে তার সন্তানের জন্য। মা মনে মনে ধরেই রেখেছে তার ছেলে যুদ্ধ থেকে ফিরে আসবেই। তাই তার কথার ধরনটা কেমন হবে? "যদি আমার সন্তান ফিরে আসে", না "যখন আমার সন্তান ফিরে আসবে"? অবশ্যই পরেরটি। কারণ সে নিশ্চিত যে তার সন্তান ফিরে আসবে। তাই সে মা কখনোই

বলবে না "যদি আমার সন্তান ফিরে আসে"। কারণ "যদি" শব্দের মধ্যে কিছুটা সন্দেহ প্রকাশ পাচ্ছে, যে তার সন্তান যুদ্ধ থেকে না-ও ফিরতে পারে।

আল্লাহ তাআলা নিশ্চিতভাবেই জানেন যে, তাঁর বান্দা অবশ্যই তাঁর দিকে ফিরে আসবে। তার ভেতর থেকে আওয়াজ আসবে। এমনকি অমুসলিমদের অন্তর থেকেও আওয়াজ আসে। শিরক করলেও তারা সবাই সৃষ্টিকর্তার ব্যাপারে জানে। কখনো না কখনো অবশ্যই গুনাহগারের অন্তর থেকে "আহ" বের হয়ে আসেই।

আল্লাহ তা'আলা অপেক্ষা করে আছেন, কখন তাঁর বান্দারা ডাকবে। পৃথিবীতে কত রাজা-বাদশা আছে, কিন্তু তিনি রাজাদের রাজা, বাদশাহেরও বাদশা। যিনি পছন্দ করেন তাঁর ব্যাপারে বারবার যেন জিজ্ঞাসা করা হোক। যিনি পছন্দ করেন কবিরা গুনাহ করার পরেও যেন তাঁর কাছে মাফ চাওয়া হয়। তিনি পরম ক্ষমাশীল ও দয়ালু। তিনি আপনাকে ডাকছেন, কিন্তু আপনিই যোগাযোগ করছেন না।

এই আয়াতটা অনুভব করার চেষ্টা করুন। দুনিয়ার সবাই হয়তো আপনাকে ছেড়ে চলে যেতে পারে। একটা সময় চলে আসবে, যখন সবাই আপনার প্রতি বিরক্ত হয়ে যাবে। এমনকি বাবা-মারাও বাচ্চাদের প্রতি একসময় বিরক্ত হয়ে যায়। কিন্তু আল্লাহ আপনাকে কখনো ছেড়ে যাবেন না।

একজন মা তার সন্তানকে কতই না ভালোবাসে। মায়ের সৃষ্টিকর্তা হচ্ছেন আল্লাহ। আর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন যে, রহমতের একশ অংশের মধ্যে একটি অংশই আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীতে বণ্টন করেছেন সবার মাঝে। আপনি পৃথিবীতে যত রকমের ভালোবাসা দেখেন, যেমন সন্তানের প্রতি মায়ের, স্বামী-স্ত্রী ভালোবাসা এগুলো সবই সে এক অংশের ভালোবাসা। তাহলে কল্পনা করে দেখুন যে আল্লাহ আপনাকে কতটা ভালোবাসেন। বাবা-মা সবাই এক না এক সময় দুনিয়া ছেড়ে চলে যাবে, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা আগে থেকেই ছিলেন এবং ভবিষ্যতেও থাকবেন। আমাদের দাদা-দাদী, নানা-নানী, আমাদেরকে ভালোবাসে এমন লোকজন, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন সবাইকেই চলে যেতে হবে। শুধুমাত্র, একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই আপনার জীবনের স্থির থাকবেন এবং তিনি একেবারেই নিকটে। আপনি যাই করেন না কেন, তিনি কখনো আপনাকে ছেড়ে যাবেন না।

কিন্তু এই শয়তান আপনার সামনে পর্দা ফেলে দিয়েছে। তাই সে ভালোবাসা আপনার চোখে পড়ছে না। আপনার চোখে শুধু এটাই পড়ছে যে, আল্লাহ আপনার দোয়া কবুল করেননি। এটা দেখছেন না যে, তিনি আপনাকে কোন কোন পরিস্থিতি

থেকে বাঁচিয়েছেন। আপনার কোন কোন ভুল তিনি মাফ করে দিয়েছেন। তিনি যদি মানুষকে এর জন্য পাকড়াও করতেন, তাহলে মানবজাতি অনেক আগে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত।

তাই সবার আগে আল্লাহর কাছে যান। যেভাবে আল্লাহ তা'আলা আপনার অন্তরের ব্যথা, আপনার মনের কথাগুলো বুঝতে পারবেন, সেটা কোনো মানুষই বুঝতে পারবে না। আল্লাহ তা'আলা আপনাকে যেমনটা ভালোবাসেন, সেরকম ভালোবাসা কোনো মানুষই দিতে পারবে না। এমনকি মা-ও না।

মুসা আলাইহিসসাল্লাম এর যুগে বনি ইসরাইলে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। ফলে জনসাধারণ মুসা আলাইহিসসালাম এর কাছে জমায়েত হয়ে বৃষ্টির জন্য আল্লাহর দরবারে দোয়া করার জন্য সবিনয়ে অনুরোধ জানায়। তাদের অনুরোধে সাড়া দিয়ে মুসা আলাইহিসসালাম সত্তর হাজার বা ততোধিক সংখ্যক লোকজনের বিশাল বহর নিয়ে এক মরু প্রান্তরে উপস্থিত হয়ে দোয়া আরম্ভ করলেন।

"হে প্রভু! আমাদের উপর আপনার রহমতের বৃষ্টি বর্ষণ করুন; আপনার রহমত বিস্তৃত করুন; আপনার দয়া উন্মুক্ত করুন; দুগ্ধপোষ্য শিশুদের, তৃণভোজী পশুদের এবং রুকুকারী বয়োবৃদ্ধদের ওসিলায় আমাদের উপর রহম ও করুনা করুন।"

এসময় আকাশের কঠোরতা, সূর্যের তীব্রতা আরো বৃদ্ধি পায়। মুসা আলাইহিসসালাম আবারো আল্লাহর দরবারে আর্জি পেশ করলেন -

"হে দয়াময় প্রভু! যদি আপনার সুমহান দরবারে আমার মান মর্যাদা জীর্ন হয়ে থাকে, তবে উম্মি নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উসিলায় আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করুন।"

তখন আল্লাহ মুসা আলাইহিসসালাম এর কাছে এই মর্মে ওহি পাঠালেন,

"হে মুসা! আমার দরবারে তোমার মর্যাদা জীর্ন হয়নি, আমার কাছে তুমি মর্যাদাবান হিসেবেই অবস্থান করছ। তবে তোমাদের মধ্যে এমন এক ব্যক্তি উপস্থিত আছে, যে চল্লিশ বছর যাবৎ গোনাহ ও অবাধ্যতার মাধ্যমে আমার প্রতিদ্বন্দ্বীতা করে আসছে। তুমি উপস্থিত লোকজনের মাঝে ঘোষণা করে দাও, যাতে সেই লোকটি তোমাদের মধ্য থেকে বেরিয়ে যায়। তার কারণেই তোমাদেরকে আমার রহমতের বারিধারা থেকে বঞ্চিত রাখছি।"

মুসা আলাইহিসসালাম নিবেদন করলেন, "করুণাময় প্রভু! আমি একজন দুর্বল বান্দা, আমার আওয়াজও দুর্বল। এই বিশাল সমাগমে কীভাবে আমার আওয়াজ

পৌঁছাবে?" আল্লাহ ওহি পাঠালেন "তোমার কাজ আওয়াজ দেয়া, আর আমার কাজ তা পৌঁছে দেয়া।"

আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী মুসা আলাইহিসসালাম দাঁড়িয়ে এই বলে আওয়াজ তুললেন -

"হে অমুক অপরাধী বান্দা, যে চল্লিশ বছর যাবৎ মহান রবের সঙ্গে নাফরমানীতে লিপ্ত। আমাদের মধ্য থেকে বেরিয়ে যাও। তোমার কারণে আমরা সবাই রহমতের বৃষ্টিপাত থেকে বঞ্চিত হচ্ছি।"

এ ঘোষণায় ওই ব্যক্তির টনক নড়ল। লজ্জিত ও অপমানিত হওয়ার ভয়ে সে মহান স্রষ্টা, দয়াময় আল্লাহর কাছে ধরা দেবার মানসে সে মাথা ঢেকে তার কর্মকান্ডের উপর লজ্জাবনত হয়ে আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করলো -

"হে আমার প্রভু! হে আমার প্রতিপালক। চল্লিশ বছর ধরে আপনার অবাধ্যতা করে আসছি আর আপনিও আমাকে অবকাশ দিয়েছেন। এবার আপনারই অনুগত হয়ে আপনারই সুমহান দরবারে উপস্থিত হয়েছি। অতএব, আমার অনুগত হওয়াকে আপনি কবুল করুন।"

তার কথা শেষ না হতেই আকাশে এক খণ্ড মেঘমালা ভেসে উঠল এবং মুসলধারে বৃষ্টি বর্ষণ শুরু হলো। হঠাৎ বৃষ্টি বর্ষণের দৃশ্য অবলোকন করে মুসা আলাইহিসসালাম বললেন, "হে আল্লাহ! কী কারণে আমাদের প্রতি আপনার অনুকম্পা বৃষ্টি বর্ষণ করলেন? অথচ ঘোষণামতে আমাদের মধ্য থেকে তো কেউই বের হয়নি।"

আল্লাহ জানালেন, "যার কারণে তোমাদেরকে বৃষ্টি বর্ষণ থেকে বঞ্চিত রেখেছিলাম, তার কারণেই বৃষ্টি দিলাম।" মুসা আলাইহিসসালাম বললেন, "হে আল্লাহ! আপনার একান্ত অনুগত বান্দাকে আমার দেখার সুযোগ করে দিন।"

আল্লাহ বললেন, "মুসা, এতদিন যাবত সে আমার অবাধ্যতা করেছে, অথচ আমি তাকে অপদস্থ ও অপমানিত করিনি। এখন সে আমার অনুগত ও বাধ্যগত হয়েছে, এখন তাকে আমি অপদস্থ ও অপমানিত করবো?"[৬]

এটাই মানুষদের সাথে আল্লাহ তা'আলার মহাব্বত। আল্লাহ আপনাকে শাস্তি দিতে চান না।

---

[৬] কিতাবুত্তাওয়াবিন; পৃষ্ঠা: ৬৮; জিবালুল জুনুব, পৃষ্ঠা: ১০১

ধরুন, এক ব্যক্তি অফিসে ঠিকমতো যায় না। শুধু সপ্তাহে একবার হাজিরা দেওয়ার জন্য যায়। তার বস তাকে কী বলবে? বিনা নোটিসে তার চাকরি চলে গিয়ে আরেকজন নিয়োগ পাবে সেখানে। দুনিয়াতে মানুষের সাথেই এমন হয়। কিন্তু আল্লাহর দরবার ভিন্নরকম। এত এত গুনাহর পরও ক্ষমাপ্রার্থনার দুয়ার খোলা।

এক ডাকাতসর্দারের পথবদল

ফুজাইল ইবনে আয়াজ। তার সময়ের সেরা ডাকাত। পথচারীরা তার ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত থাকতো। কুরআনুল কারিমের একটি আয়াত শুনেই পাল্টে গেল তার জীবন। তিনি হয়ে গেলেন বিপথগামী যুবকদের জন্য আদর্শ। খুঁজে পেলেন সঠিক পথের ঠিকানা।

ডাকাত থাকাকালে তিনি এক তরুণীর প্রেমে গভীরভাবে আসক্ত হন। একরাতে তিনি ওই তরুণীর ঘরে ঢুকতে দেয়াল বেয়ে উঠছিলেন। এমন সময় তিনি শুনতে পেলেন, কেউ একজন সূরাহ হাদিদ-এর একটি আয়াত তেলাওয়াত করছেন।

أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ ۖ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ

> “যারা মুমিন তাদের জন্য কি আল্লাহর স্মরণে এবং যে সত্য অবতীর্ণ হয়েছে, তার কারণে হৃদয় বিগলিত হওয়ার সময় আসেনি? তারা তাদের মতো যেন না হয়, যাদের আগে কিতাব দেয়া হয়েছিল। তাদের উপর সুদীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হয়েছে, অতপর তাদের অন্তর কঠিন হয়ে গেছে। তাদের অধিকাংশই পাপাচারী।” (সূরাহ হাদিদ, ৫৭:১৬)

ফুজাইল ইবনে আয়াজ এ আয়াত শুনে এতবেশি প্রভাবিত হলেন যে, তখনই তাওবাহ করলেন। অন্যায় থেকে ফিরে আসার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। সে রাতে ফুজাইল ইবনে আয়াজ আর ঘরে ফিরে যাননি। কাছাকাছি কোনো এক নির্জন স্থানে রাত কাটানোর সিদ্ধান্ত নেন। ওই নির্জন স্থানে অবস্থানের সময় তিনি তার নিজের সম্পর্কে কিছু মুসাফিরের ভয় ও সতর্কতার কথা শুনতে পান। তারা তাদের সঙ্গীদের চিৎকার করে এ কথা বলছিল,

"সাবধান! সাবধান! সামনেই ফুজাইল আছে; সে তোমাদের সব কিছু লুট করে নিয়ে যাবে।"

এবার ফুজাইল ইবনে আয়াজ চিৎকার করে মুসাফিরদের উদ্দেশ্যে বলতে লাগলেন,

"হে মুসাফির দল! ফুজাইল ইবনে আয়াজ তাওবাহ করেছে।"

এ ঘোষণা দিয়ে তিনি তাদের কোনো কিছু লুট না করার মর্মে তাদের নিরাপদ সফরের নিশ্চয়তা দেন। এ ছিল ফুজাইল ইবনে আয়াজের হিদায়াত লাভের ঘটনা। তিনি হয়ে গেলেন দুনিয়ার সব যুবকের হিদায়াত পাওয়ার অন্যতম আদর্শ। কুরআনের একটি মাত্র আয়াতের চিন্তা ও প্রতিক্রিয়ায় পরিবর্তন হয়ে গেল তার জীবন।

আমরা কীভাবে পাল্টাব?

কীভাবে নিজেকে পরিবর্তন করা যায়, সে ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা আমাদের বলেছেন

نَّحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ ۚ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى

"তারা ছিল কয়েকজন যুবক। তারা তাদের পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল এবং আমি তাদের সৎপথে চলার শক্তি বাড়িয়ে দিয়েছিলাম।" (সূরাহ কাহফ, ১৮:১৩)

তাই সবচেয়ে প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে নিজের রবের প্রতি বিশ্বাস রাখা। রবই তখন শক্তি বাড়িয়ে দেন। আপনার কিসের ভয়? এমনটা কখনোই হতে পারে না যে আপনি আল্লাহর জন্য দুনিয়ার কোনো জিনিস ছাড়লেন আর আল্লাহ তার চেয়ে উত্তম জিনিস আপনাকে দুনিয়াতেই দিবেন না।

যেমন পাকিস্তানের বিখ্যাত পপশিল্পী জুনায়েদ জামশেদ এমন একটা জীবন ছেড়ে ইসলামের পথে এসেছিলেন, যেখানে তার অনেক ফ্যান-ফলোয়ার, খ্যাতি আর টাকা-পয়সা ছিল। সঙ্গীতজীবন ছাড়ার পর কী হয়েছিল? ওনার ফ্যান-ফলোয়ার, খ্যাতি চলে গিয়েছিল? আল্লাহ তার চেয়ে উত্তম জিনিস তাকে দিয়েছেন। এখনো অনেক নেক লোক তার জন্য দোয়া করে। তিনি যদি শিল্পী অবস্থায় মারা যেতেন, তাহলে কি এত নেককার লোক তার জন্য দোয়া করত? মানুষ তাকে ভালোবাসে

এই জন্য না যে তিনি গান গাইতেন বরং এই জন্য যে, তিনি আল্লাহর পথে এসেছিলেন।

আপনি হিজাব পরা শুরু করেছেন। নামাজ পড়া শুরু করেছেন। হারাম খাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন। সিগারেট খাওয়া, গালিগালাজ করা সব ছেড়ে দিয়েছেন। কিসের ভয় আপনার মনে? বন্ধুবান্ধব চলে যাবে? জব চলে যাবে? বিশ্বাস করুন কেয়ামতের দিন মানুষ আফসোস করবে আপনার বদলে অন্য কারো বন্ধু হয়েছিল বলে।

يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا

"হায় আমার দুর্ভাগ্য, আমি যদি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম।" (সূরাহ ফুরকান, ২৫:২৮)

তাই যে বন্ধুদের চলে যাওয়ার, তারা চলে যাক। তার পরিবর্তে আল্লাহ আপনাকে এমন বন্ধু দেবেন, যে আপনাকে সত্যিকারেই ভালোবাসবে। এছাড়া এমনও হতে পারে আল্লাহ তাআলা আপনার মাধ্যমে আপনার বন্ধুদের পরিবর্তিত করে দিলেন। যেমন খালিদ বিন ওয়ালিদকে দেখে আমর ইবনুল আস হিদায়াতের পথে আসেন। তাই হতে পারে আপনাকে দেখে আপনার বন্ধুরা নিজেদের পাল্টে নেবে।

কিন্তু তাও যদি না হয়, বরং তারা আগের মতোই থাকে এবং আপনাকে নিয়ে ট্রল করে, তাহলে তারা কি সত্যিই আপনার বন্ধু? বন্ধুরা কি এমন হয়? বন্ধুরা তো একে অপরকে সাহায্য সহযোগিতা করে। তাই এগুলো সবই শয়তানের পক্ষ থেকে ভয়। হতে পারে আপনার আগে যা ছিলো, তার দ্বিগুণ বৃদ্ধি হয়ে যাবে। যদি না-ও হয়, তাতেই বা কী হবে? আল্লাহ তাআলার কাছে তো আপনার মর্যাদা বেড়ে যাবে।

আল্লাহ তা'আলা কুরআনে এমন কিছু মানুষের আফসোসের কথা জানিয়েছেন, যারা নিজেকে পরিবর্তন করতে পারবেনা।

يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي

"সে বলবে, হায়, এ জীবনের জন্যে আমি যদি কিছু (নেক আমল) অগ্রে প্রেরণ করতাম!" (সূরাহ ফজর, ৮৯:২৪)

وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا

"জালেম সেদিন আপন হস্তদ্বয় দংশন করতে করতে বলবে, হায় আফসোস! আমি যদি রসূলের সাথে পথ অবলম্বন করতাম।" (সূরাহ ফুরকান, ২৫:২৭)

ইসলাম একটা ম্যারাথন দৌড়ের মতো। একশত মিটার স্প্রিন্টের মতো নয় যে, দশ সেকেন্ডের মধ্যেই লক্ষ্যে পৌঁছতে হবে। তাই নামাজ দিয়েই শুরু করুন। নামাজকে ছাড়বেন না। আল্লাহ তা'আলার সাথে সাক্ষাতকে ছাড়বেন না। নামাজ মানেই হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার সাথে সাক্ষাৎ। দিনে পাঁচবার এই সাক্ষাৎ অবশ্যই করুন। ব্যস এতোটুকুই। তারপর ইসলামের বাকি জিনিসগুলো এমনিই আপনার মধ্যে চলে আসবে। এতটা লম্বা To do List দেখে ঘাবড়ে যাবেন না। আল্লাহ আপনার জন্য বাকি জিনিসগুলো সহজ করে দিবেন।

তাই দুশ্চিন্তা করবেন না। পরিবর্তন হওয়ার ব্যাপারে ঘাবড়ে যাবেন না। শুধু মনের ভেতরের সেই আকাঙ্ক্ষাটুকু জাগ্রত করুন। আল্লাহ তা'আলার সাথে কথা বলুন।

পরিবর্তন ধরে রাখতে না পারার কারণ

মানুষ কেন নিজের মধ্যে পরিবর্তন ধরে রাখতে পারে না, এর কিছু কারণ উল্লেখ হলো:

প্রথমত, মোটিভেশনটা ধরে রাখতে না পারা। তাই এই মোটিভেশন ধরে রাখার জন্যই প্রতিদিন আল্লাহ তা'আলার কাছে দোয়া করুন। বিশেষ করে রাতে ঘুমানোর আগে। নিজের আমলগুলোর দিকে ফিরে তাকান। মনে রাখবেন সত্যিকারের মোটিভেশন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকেই আসে। যদি মন না চায়, তারপরও আল্লাহ তা'আলার কাছে হাত তুলুন। যদি হাত না-ও তুলতে পারেন, তাহলে অন্তত অন্তর থেকে আল্লাহ তা'আলার সাথে কথা বলুন।

দ্বিতীয়ত, ইচ্ছা থাকলেও ইচ্ছাশক্তি না থাকা। মেন্টাল সাপোর্ট ও পরিবেশ না থাকা। তাই নিজের পরিবেশটাকে পরিবর্তন করুন। ভালো পরিবেশে যাওয়া শুরু করুন। মসজিদে, ইল্‌মের সমাবেশে, ওয়াজ মাহফিলে যাওয়ার চেষ্টা করুন। ভালো মানুষদের বন্ধু বানান। এমন কোন আলিমের সাথে যোগাযোগ করুন, যিনি আপনাকে গাইড করবেন।

তৃতীয়ত, অনর্থক হতাশা। অনেকে মনে করে পরিবর্তন আনলে তারা অমুক অমুক জিনিসটা পাবে। পরিবর্তিত হওয়ার পরে যখন তারা সেটা পায় না, তখন হতাশ হয়ে যায়। যেমন অনেকেই শুনে থাকবেন যে দ্বীনের মধ্যে আসলে জীবন সুন্দর হয়ে যায়। কিন্তু দেখা গেল জীবনে বিপদ-আপদ, মুশকিল, বিদ্রূপ, বিরোধিতা আরো বেড়েছে। তাহলে কি আবার দ্বীন ছেড়ে দেবেন? না। খন্দকের যুদ্ধে বিশাল শত্রুসেনার সমাবেশ দেখে মুনাফিকরা হাউমাউ শুরু করে। পক্ষান্তরে সাহাবিদের ঈমান আরো বেড়ে যায় তাতে। খুশি হয়ে তারা বলেন, "আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তো এরই ওয়াদা করেছিলেন!"

এখনই...

(মানুষ কোনো ব্যথা বা দুর্ঘটনার মুখোমুখি না পাওয়া পর্যন্ত তার টনক নড়ে না। তাই সেই সময় পর্যন্ত অপেক্ষা না করে এখনই নিজেকে পরিবর্তন করুন। হতে পারে সেই ব্যাথা আপনাকে মৃত্যুর দিকে নিয়ে যাবে। এখনই সেই সময়। আপনার এখনই পরিবর্তন হওয়া দরকার। ছোট ছোট পদক্ষেপ দিয়ে শুরু করুন। জেনে রাখুন আল্লাহ নিকটেই আছেন। তিনি আপনার কথা শুনবেন।

সুখের সন্ধানে

মানুষের জন্য সুখে থাকাটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। সুখে থাকতে গেলে কী করা লাগে বলে মনে হয় আপনার? সুখ কি নিজের ভেতর আপনা-আপনি আসে? নাকি সুখে থাকার জন্য নিজের মধ্যে কিছু গুণ থাকার প্রয়োজন? প্রত্যেক মানুষেরই সুখে থাকার জন্য কোনো না কোনো জিনিসের প্রয়োজন হয়। জীবনের ব্যাপারে প্রত্যেক মানুষেরই আলাদা দর্শন থাকে। সুখের ব্যাপারেও প্রতিটি মানুষেরই আলাদা দৃষ্টিভঙ্গি থাকে। আপনি ভালো করে চিন্তা করুন কোন জিনিসগুলো আপনাকে খুশি রাখে।

কিছু মানুষ ভালো খাবার খেয়ে অনেক আনন্দ পায়। কেউ টাকা-পয়সা উপার্জন করে পায়। আবার কেউ সেটা পায় তার পছন্দের মানুষের সাথে গল্প গুজব করার মাঝে।

আল্লাহ তাআলা প্রতিটা মানুষকে দুনিয়াবী কিছু বিষয়ের প্রতি কামনা-বাসনা ও আকাঙ্ক্ষা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেন

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ

"মানবকূলকে মোহগ্রস্ত করেছে নারী, সন্তান-সন্ততি, রাশিকৃত স্বর্ণ-রৌপ্য, চিহ্নিত অশ্ব, গবাদি পশুরাজি এবং ক্ষেত-খামারের মত আকর্ষণীয় বস্তুসামগ্রী। এ সবই হচ্ছে পার্থিব জীবনের ভোগ্য বস্তু। আল্লাহর নিকটই হলো উত্তম আশ্রয়।" (সূরাহ আলে ইমরান, ৩: ১৪)

দাম্পত্যসঙ্গী, সন্তান, অর্থ-সম্পদ এগুলোকে মানুষের জন্য আকর্ষণীয় করে বানানো হয়েছে। এগুলোর চাহিদা দিয়ে আমাদেরকে প্রোগ্রাম করা হয়েছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এগুলো আমরা কেন চাই? যখন এই জিনিসগুলো আমাদের হাতে আসে, তখন আমাদের মনে আসলে কী হয়? দিন শেষে এর উত্তর হচ্ছে সেটাই, যা আমরা সকলেই জানি: "আমরা সুখে থাকবো।"

যদি আমি ইউনিভার্সিটি বা মেডিকেলে চান্স পেয়ে যাই, তাহলে আমি সুখী হব। কাঙ্ক্ষিত চাকরিটা যদি পেয়ে যাই, তাহলে আমি সুখী হব। পছন্দের মানুষটাকে যদি বিয়ে করতে পারি, তাহলে সুখী হব। যদি ফ্ল্যাট কিনতে পারি, সুখী হব।

এই জিনিসগুলোর মাধ্যমে আমরা জীবনে সুখ পাবার চেষ্টা করে থাকি। এই স্বপ্নগুলো অর্জন করার জন্য আমাদেরকে অনেক বাধা-বিপত্তি, কষ্টের শিকার হতে হয়। যেমন আপনি এখন যে চাকরী করছেন, সেটা হয়ত পছন্দ করেন না। কিন্তু সেই চাকরীর বেতন থেকে টাকা জমিয়ে আপনি হয়তো আপনার পছন্দের কোনো একটা জিনিস কিনবেন, যেটা আপনাকে সুখে রাখবে। আবার কিছু বাচ্চা হয়তো তাদের হাত খরচের টাকা জমিয়ে পছন্দের কোনো জিনিস কিনতে চায়। অন্য বাচ্চারা হয়তো চকলেট বা খেলনার জিনিস কিনছে। কিন্তু সে সেগুলোকে জমিয়ে তার চেয়ে অন্য একটা জিনিস কিনবে, যেটা তাকে আরো বেশি আনন্দ দেবে।

আবার দেখবেন কিছু ছাত্র কলেজ-ইউনিভার্সিটিতে অনেক পড়াশোনা করে। যদিও পড়াশোনা করতে কারোরই ভালো লাগে না। অন্যদিকে তার ক্লাসমেটরা মজা করে, আড্ডা দিয়ে, ঘোরাঘুরিতে তাদের সময় কাটায়। এই বিষয়গুলোই তাদের আনন্দ দেয়। কিন্তু অধিক পড়াশোনা করা ছাত্রটি মনে করে, হ্যাঁ, এগুলো করে আনন্দ পাওয়া যায় বটে। কিন্তু তার কাছে সুখে থাকা মানে হচ্ছে ভালোভাবে পড়াশোনা শেষ করে ভালো কোনো চাকরি করা এবং নিজেকে আর্থিকভাবে সক্ষম করা।

আমাদের জীবনের একটা বড় অংশ জুড়ে এই ছোট ছোট সুখকে বিসর্জন দিয়ে বড় সুখের পিছনে ছুটতে থাকি। কিন্তু সুখের এই অনুভূতিটা খুবই অস্থায়ী। ধরেন আপনি কোনো সুন্দর জায়গায় বেড়াতে গেলেন। সেখানকার ঝরনা, পাহাড় দেখে অনেক আনন্দ পেলেন। কিন্তু সেই একই জায়গায় যদি আবার বেড়াতে যান, তাহলে প্রথমবারের মতো সে অনুভূতি পাবেন না। ঠিক একইভাবে নতুন গাড়ি, নতুন বাড়ি কিনেন বা ঈদের নতুন পোশাকের আনন্দ এক-দুই মাস পরে আর থাকে না। তাই সুখ কখনো কোনো বস্তুগত জিনিসে পাওয়া যায় না। কারণ যে

মুহূর্তে আমি আনন্দ করছি, কিছু সময় পরে সে মুহূর্তের পরিবর্তন হয় এবং সেই আনন্দটা আমরা ধরে রাখতে পারি না।

আবার আমাদের জীবনে সুখের পাশাপাশি দুঃখও আসে। এমন মানুষ নেই, যাকে কোনো প্রকার দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করেনি। সেটা দূর করার জন্য আপনি কী করেন? কীভাবে এটাকে কাউন্টার করেন?

কেউ সেটা অন্য মানুষের সাথে শেয়ার করার চেষ্টা করে। কেউ বিনোদনে ডুব দেয়। কেউ পরিশ্রম করে চলে সেই দুঃখের অবস্থা কাটানোর জন্য। কেউবা হাল ছেড়ে বসে থাকে। কিন্তু যত যা-ই হোক, আল্লাহ আপনাকে এমন একটা অবস্থার মধ্যে ফেলে দেবেন না, যেটার মোকাবেলা আপনি করতে পারবেন না। আল্লাহ কুরআনে বলেছেন :

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

"আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যাতীত কোনো কাজের ভার দেন না।" (সূরাহ বাকারা, ২:২৮৬)

আপনার ঈমান যত মজবুত হবে, আপনি ঠিক তত বড় কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হবেন। তেমনিভাবে আল্লাহর নবী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর সবচেয়ে বেশি দুঃখ-কষ্ট এসেছিল। আবার তিনি সবচেয়ে বেশি সুখীও ছিলেন। এটাই আসলে আমাদের জন্য ভাবনার বিষয়। তিনি যেমন শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন, আবার সবচেয়ে বেশি মানসিক চাপও সহ্য করেছেন। একজন মিথ্যুককে মিথ্যুক বলা হলে সেও কষ্ট পাবে। তাহলে ভেবে দেখুন একজন সত্যবাদী মানুষকে মিথ্যা অপবাদ দেয়া হলে তিনি কেমন কষ্ট পাবেন! তিনি হচ্ছেন সেই মানুষ, যিনি চল্লিশ বছর ধরে সত্যবাদী ও ন্যায়-নিষ্ঠাবান হিসেবে সবার কাছে পরিচিত ছিলেন। এই মানুষটাকেই যদি হঠাৎ সবাই পাগল, জাদুকর এবং কবি বলা শুরু করে, তখন তো তিনি মানসিক কষ্ট পাবেনই।

এগুলোর পরেও তিনি সবচেয়ে খুশি ছিলেন। এই বিষয়টা প্রত্যেক মানুষের ভাবা উচিত। তাঁর মধ্যে কী কী গুণ ছিল, যার কারণে কঠিন থেকে কঠিনতর অবস্থাতেও তিনি সুখী ছিলেন, প্রশান্তিতে ছিলেন?

সুখ আর প্রশান্তি দুটোর মধ্যে কি কোনো পার্থক্য আছে? আল্লাহ তায়ালা আমাদের জন্য কি সুখের ওয়াদা করেছিলেন, না প্রশান্তির? কিন্তু খুশি বা আনন্দিত হওয়াটা একটি অস্থায়ী অনুভূতি। কোনোকিছু প্রাপ্তির সাথে এর সম্পর্ক। আপনার বাবা যদি

মারা যান (আল্লাহ না করুন), আপনি কি খুশি হবেন? অবশ্যই না। কেউই খুশি হবে না। কিন্তু তখনও অন্তরে একটা প্রশান্তি আসবে, যদি আপনার তাকদীরের উপরে বিশ্বাস থাকে। যদি আপনার আল্লাহর প্রতি ঈমান থাকে এবং আপনি যদি জান্নাত, জাহান্নামের উপর বিশ্বাস করেন। আপনি তখন জানবেন যে, আপনার বাবা অন্য জগতে জীবিত। এখন আপনার কাজ তার জন্য দোয়া করা, যাতে সেখানে আল্লাহ যাতে উনাকে শান্তিতে রাখে। এটাই হচ্ছে প্রশান্তি।

ঠিক একইভাবে আপনার যদি বড় কোনো ক্ষতি হয়ে যায়, তাহলে আপনি কি খুশি হবেন? যেমন আপনার গাড়ি যদি চুরি হয়ে যায় বা ব্যবসায় যদি বড় কোনো লস হয়? অবশ্যই না। কিন্তু যে মুমিন, সে কোনো কষ্ট পেলে কী বলে? সে বলে, "সর্বাবস্থায় আলহামদুলিল্লাহ।"

যখন সে খুশি হয়, তখনও বলে, "আলহামদুলিল্লাহ।" কষ্ট পেলেও "আলহামদুলিল্লাহ।" তখন তার অন্তরের প্রশান্তি থাকবে এই ভেবে যে, "জিনিসটা ফিরে আসলে ঠিক আছে। আর যদি না আসে, তাহলে এটাই আল্লাহ আমার জন্য লিখে রেখেছেন।" এই ভাবনার কারণে তার অন্তরে প্রশান্তি আসবে। দ্বীন ইসলাম আমাদের জন্য প্রশান্তির ওয়াদা করেছে। আর এই দুনিয়াতে পরিপূর্ণ সুখী হওয়া (অ্যাবসোলিউট হ্যাপিনেস) একেবারেই অসম্ভব। কিন্তু প্রশান্তির ওয়াদা চিরন্তন। আর সেটা আল্লাহর জিকিরের মাধ্যমেই পাওয়া যায়।

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

"যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাদের অন্তর আল্লাহর জিকির দ্বারা শান্তি লাভ করে; জেনে রাখ, আল্লাহর জিকির দ্বারাই অন্তরসমূহ শান্তি পায়।"
(সূরাহ রা'দ, ১৩:২৮)

যে আল্লাহর জিকির করে, কঠিন সময় আল্লাহকে স্মরণ করে, এই প্রশান্তির প্রতিশ্রুতি তার জন্য। আমি আমার পরিচিত বেশ কয়েকজন বড় ব্যবসায়ীদের দেখেছি। আপনারা বিশ্বাস করবেন কি না জানি না, তাদের চোখে মুখে প্রশান্তির কোনো ছাপ থাকে না। তাদের চেহারায় একটা শূন্যতার ও দ্বিধা-দ্বন্দ্বের ছাপ দেখি সবসময়। মনে হচ্ছে তারা যেন নিজেকে নিজে খুঁজে বেড়াচ্ছে। হয়তো তাদেরকে বাইরের দিক থেকে দেখলে অনেক সুখী মনে হবে। কিন্তু তাদের নিজেদের ভেতরে আছে একটা গভীর শূন্যতা। এটার কারণ কী? কারণ তাদের মধ্যে প্রশান্তির অভাব আছে। তারা সব সময় একটা টেনশনে থাকে, যদি তাদের ব্যবসায় ক্ষতি হয়ে যায়।

পশ্চিমা দেশগুলোতে এর অনেক উদাহরণ আছে। ধরুন কেউ ১৪০ মিলিয়ন ডলারের মালিক। তার ১০ মিলিয়ন ডলারের ক্ষতি হয়ে গেল। এতেই সে মানুষটা আত্মহত্যা করে ফেলে। আবার অনেকে মানুষ ছোট ছোট ঘটনার কারণে আত্মহত্যা করে ফেলে। যেমন পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট না করতে পারলে বা ভালোবাসার মানুষকে না পেলে। বাংলাদেশেও আত্মহত্যা প্রতিনিয়তই বাড়ছে। এর কারণটা কী? প্রশান্তির অভাব।

প্রশান্তির সাথে মানুষ সুখীও থাকবে, এমনটা সব সময় না-ও হতে পারে। বাবার মৃত্যুর উদাহরণটাই দেখুন। এ ঘটনায় প্রশান্তি স্বাভাবিক হলেও সুখী হওয়া নিরেট অবাস্তব।

এখন কথা হচ্ছে আমরা সবাই সুখের পিছনে ছুটে বেড়াই। ছুটতে ছুটতে আমরা এমন কিছু কাজ করে ফেলি, যা আমাদের শরীয়তের বিরুদ্ধে যায়। এটা কী জন্য করি? যাতে খুশি থাকতে পারি। কিন্তু আমাদের দ্বীন ইসলাম এতটাই সুন্দর, এতটাই পরিপূর্ণ জীবনবিধান যে, এটা আমাদের ভেতরে এমনসব গুণাবলীর জন্ম দেয়, যার ফলে আমরা সুখের পিছনে ছুটবো না বরং সুখ আমাদের পিছনে ছুটে বেড়াবে। কিন্তু সুখের ব্যাপারেও মানুষের ভুল ধারণা থাকতে পারে। মিডিয়া, বিলবোর্ড, টেলিভিশন, মুভি, ড্রামা সিরিজগুলো দেখে আপনি কী উপসংহারে এসে পৌঁছেন, তাদের দৃষ্টিতে সুখ মানে কী?

সেটা হচ্ছে, "মনে যা আসে, তা-ই করো। সেটা বৈধ-অবৈধ যা-ই হোক।" আশেপাশে এমন অনেককে পাবেন, যারা তাদের পরিবারের দায়িত্ব থেকে মুক্তি পেতে চায়। তারা রেস্ট্রিকশন পছন্দ করে না। তারা বলে ইসলাম অনেক রেস্ট্রিকশন দিয়েছে। ইসলাম আমাদের ওপর যেন একটা বোঝা। "আমরা ঐ জিনিসটা করতে চাই, কিন্তু ইসলাম সেটা মানা করেছে। আমরা মডেল হতে চাই, কিন্তু ইসলাম সেটা মানা করেছে। আমরা গায়ক হতে চাই, ইসলাম সেটা মানা করেছে। খালি হারাম আর হারাম!" অনেককে বলতে শুনেছি, "এত ইসলাম মানতে গেলে তো বেঁচে থাকা সম্ভব না।" বেঁচে থাকাটাই যাদের জীবনের সার্থকতা, তেলাপোকার সাথে তাদের কী তফাৎ? তাদের কাছে ইসলামের মানে হচ্ছে নিজের প্রতিটি চাহিদাকে শেষ করে দিয়ে একেবারে হুজুর হয়ে যাওয়া।

এটাই হচ্ছে তাদের ভুল ধারণা। এই ভুল ধারণা তাদের মনে কেন এসেছে? কারণ তাদের খায়েশ মেটানোর নামে সুখের সংজ্ঞা শেখানো হচ্ছে। মনে যেটা চায়, সেটাই করা। নিজের নফসকে খুশি করার চেষ্টা করা। কিন্তু জীবনের উদ্দেশ্যের

সাথে সাংঘর্ষিক হওয়ায় এই জিনিসগুলো প্রশান্তি তো দূরের কথা, এমনকি দীর্ঘস্থায়ী সুখও এনে দিতে পারে না।

দুনিয়াবন্দীর জবানবন্দী

হলিউডের অভিনেতা জিম ক্যারি একবার বলেছিলেন -

"I hope everybody could get rich and famous and will have everything they ever dreamed of, so they will know that it's not the answer."

হলিউডের আরেক অভিনেতা কিয়ানু রিভস বলেছিলেন,

"I always felt like I'm not from this generation. I just live in it. Because the way my mindset differs from the majority, you'd think I was from a different dimension. That's why I keep things to myself because a lot of people won't understand me."

এখানে আমি জিম ক্যারি এবং কিয়ানু রিভসের মতো জনপ্রিয়, বিখ্যাত ব্যক্তিদের উক্তি উল্লেখ করছি। এরা দুনিয়ার খাঁচায় বন্দী হয়ে যাওয়া মানুষ। যদি সেলিব্রেটিরা এসব বলে, তখন আমরা গুরুত্ব দিয়ে শুনি। কিন্তু হুজুররা তো সব সময় এসব কথাবার্তা বলে, কিন্তু আমরা কয়জন তাদের কথায় পাত্তা দিই?

গত কয়েক বছরের পরিসংখ্যান বলছে আমাদের সমাজে আত্মহত্যার হার তড়িৎ গতিতে বাড়ছে। বছরখানেক আগে বলিউড অভিনেতা সুশান্ত সিং আত্মহত্যা করেছেন। বিখ্যাত ব্যান্ড লিঙ্কিন পার্কের লিড ভোকাল চেষ্টার বেনিংটনের আত্মহত্যার ঘটনাও সবার জানা। টাকা পয়সা, খ্যাতি থাকার পরেও মানুষ নিজেকে নিজে মেরে ফেলছে। একটা সময় যারা আত্মহত্যা করত তাদেরকে কাপুরুষ ভাবা হতো। কিন্তু এখন আমরা তাদেরকে হিরো মনে করি। আমরা তাদের জন্য দোয়া করি আর ফেসবুকে লিখি "Rest In Peace"। অথচ এটা একটা কাপুরুষোচিত কাজ। কারণ তারা জীবনের হাল ছেড়ে দিয়েছে। এখন প্রশ্ন হলো, কেন এমনটা হচ্ছে? কেন এই মানুষগুলো জীবনের প্রতি এমনভাবে আশা হারিয়ে ফেলছে যে, তারা আত্মহত্যার মতো পথ বেছে নিচ্ছে?

কারণ একটাই – প্রশান্তির অভাব।

কীভাবে প্রশান্ত থাকা যায়

আল্লাহ তাআলা মানুষকে কিছু দায়িত্ব দিয়ে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। সে দায়িত্বটা কী? কোত্থেকে সে দায়িত্বের ব্যাপারে জানতে পারব? আল্লাহ তা'আলা কুরআনে বলেন

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم

> "তোমরাই হলে সর্বোত্তম উম্মত, মানবজাতির কল্যাণের জন্যেই তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দান করবে ও অন্যায় কাজে বাধা দেবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে।" (সূরাহ আলে ইমরান, ৩:১১০)

যখন মানুষ এই দায়িত্ব থেকে দূরে চলে যায়, তখন তার রূহ আর প্রশান্তি খুঁজে পায় না। এই দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি আমাদের আর যা যা করতে হবে, সেগুলো হলো:

১) Let It Go

Let It Go এর মানে হচ্ছে যা হয়ে গেছে, তা তো হয়েই গেছে এবং সেটা তো আপনি আর পরিবর্তন করতে পারবেন না। তাই এ নিয়ে রাগ করা ছেড়ে দিন। কেউ যদি আপনাকে পাত্তা না দেয়, তাহলে তা নিয়ে চিন্তা করার কী দরকার। ইগো, রাগ সেসব জিনিস যা আপনার উপর বোঝা তৈরি করছে, সেগুলো Let it go করুন। রাগ করা ছেড়ে দিন। শত্রুদের ক্ষমা করে দিন। আল্লাহ কুরআনে বলেন:

وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا ۗ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

> "তোমাদের মধ্যে যারা উচ্চমর্যাদা ও আর্থিক প্রাচুর্যের অধিকারী, তারা যেন কসম না খায় যে, তারা আত্মীয়-স্বজনকে, অভাবগ্রস্তকে এবং আল্লাহর পথে হিজরতকারীদেরকে কিছুই দেবে না। তাদের ক্ষমা করা উচিত এবং দোষত্রুটি উপেক্ষা করা উচিত। তোমরা কি কামনা কর না যে, আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করেন? আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়।" (সূরাহ নূর, ২৪:২২)

যদি আপনি আল্লাহর কাছ থেকে ক্ষমা পাওয়ার আশা করেন, তাহলে মানুষদের ক্ষমা করে দিতে শিখুন। তাই ঘৃণাগুলোকে ভুলে যান। মানুষের প্রতি অভিযোগগুলোকে মন থেকে মুছে ফেলুন।

২) নিজের দৃষ্টি ভঙ্গির পরিবর্তন করুন

প্রত্যেক মানুষেরই জীবনের ব্যাপারে আলাদা দৃষ্টিভঙ্গি থাকে। যেমন একটা উদাহরণ দিচ্ছি

এক লোক এক ডাক্তারের কাছে এসে বলল, "আমি চোখে দেখতে পাচ্ছি না।"

ডাক্তার বললেন, "আপনি চোখ দিয়ে শুধু সবুজ রঙের জিনিস দেখবেন, না হলে ধীরে ধীরে আপনার চোখ নষ্ট হয়ে যাবে।"

এখন সে লোকটি কি করলো? তার বাসায় গিয়ে বিছানা, আসবাবপত্র, কাপড়-চোপড় থেকে শুরু করে যা আছে, এমন কি ঘরের দেয়াল পর্যন্ত সব সবুজ রঙের করে নিল। তারপর সেই ডাক্তার যখন তা জানতে পারলেন, তখন তিনি বললেন, "সব কিছু সবুজ রঙের করার পরিবর্তে এই সবুজ চশমাটি পরে নিন এবং সবকিছুই সবুজ দেখুন।"

এটাই হচ্ছে সে জিনিস। আমরা অনেক মেহনত করে মানুষদেরকে পরিবর্তন করার চেষ্টা করি, কিন্তু নিজের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করি না। আমরা আমাদের চিন্তা ভাবনার কারণে হোঁচট খাই। আমরা নিজেরা নিজেদের মানসিকতার পরিবর্তন করার চেষ্টা করি না। আপনি আপনার চিন্তাভাবনা পরিবর্তন করে দেখুন। "হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকিল" জিকির করতে থাকুন। দেখবেন আপনার হৃদয়ে শান্তি আসবে এবং অবস্থারও পরিবর্তন দেখতে পারবেন।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে আপনি আপনার নিজের ব্যাপারে কী ভাবেন। যেটাকে আমরা self-esteem বলি। একটা মানুষ নিজের ব্যাপারে অনেক নেগেটিভ চিন্তা করে। সব সময় নিজের অবস্থার দোষারোপ করে। তাহলে সে কীভাবে সুখে থাকবে?

আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার সব মানুষকে কিছু না কিছু গুণ দিয়েছেন। আপনার কাছে হাত আছে, চোখ আছে। এছাড়া আল্লাহ আপনার ভেতরে ঐসব গুণাবলীও দিয়েছেন, যেগুলো ব্যবহার করে আপনি অনেক কিছু শিখতে পারেন এবং উপরে যেতে পারেন। কিন্তু সেজন্য চিন্তাকে পাল্টাতে হবে। যদি আপনার চিন্তা সে রকম না হয়, তাহলে কিছুই হবে না।

সাইকোলজিস্টরা বলেন কোনো মানুষের নিজের সাথে সম্পর্ক তার বাকি মানুষের সাথে সম্পর্কগুলো ডিফাইন করে। যে নিজের সম্পর্কে ভালো ধারণা রাখে না, সবার সাথে তার সম্পর্ক খারাপ হবে এটাই স্বাভাবিক।

৩) সে বিষয়গুলো নিয়ে ভাববেন না, যেটা আপনি পরিবর্তন করতে পারবেন না

যে বিষয়গুলো আপনি পরিবর্তন করতে পারবেন না, সেসব ব্যাপারে দুঃখ পাওয়া ছেড়ে দিন, সেগুলোর ব্যাপারে দুশ্চিন্তা করা ছেড়ে দিন। বরং আল্লাহ তা'আলার কাছে যান এবং তাঁর কাছে সাহায্য চান।

৪) সমালোচনা সহ্য করতে শিখুন

যদি সুখী থাকতে চান, তাহলে এই কৌশলটি ভাল করে শিখে নিন। বিশেষ করে নারীরা। যদি আপনাকে কেউ কিছু বলে ফেলে, তাহলে সেটাকে ম্যানেজ করা শিখুন। অনেক সময় দেখা যায় আমাদের বাবা-মা আমাদের সাথে বকাঝকা করেন, গালমন্দ করেন। এখান থেকে এটা বুঝবেন না যে, তিনি আপনাকে অপছন্দ করেন। তিনি আপনাকে ভালোবাসেন এবং সে ভালোবাসাটা হয়তো বকা দেওয়ার মাধ্যমে প্রকাশ করছেন।

অন্যদিকে আপনার স্বামী বা স্ত্রী আপনার উপর অনেক চিৎকার, চেঁচামেচি করে। আপনি হয়তো ভাবছেন সে আপনাকে অপমান করছে, অসম্মান করছে। কিন্তু কিছু

মানুষের অভ্যাসই এমন। এটা আমরা বদলাতে পারবো না। আমরা তাদের জন্য শুধু দোয়াই করতে পারি। আল্লাহ কুরআনে বলেন -

وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ ۗ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا

"আমি তোমাদের এককে অপরের জন্যে পরীক্ষাস্বরূপ করেছি। দেখি, তোমরা সবর কর কি না। আপনার পালনকর্তা সব কিছু দেখেন।" (সূরাহ ফুরকান, ২৫:২০)

আল্লাহ আমাদের একে অপরকে পরীক্ষার জন্য বানিয়ছেন। তাই ধৈর্য ধরুন। আল্লাহ তা'আলা সবই দেখছেন।

৫) ছোট ছোট আনন্দের মুহূর্ত থেকে সুখ খুঁজে নিন

আমাদের জীবনের ছোট ছোট সুখের মুহূর্তগুলো আসতে থাকে কিন্তু আমরা সেদিকে খেয়ালই করি না। উল্টো সেগুলো বরবাদ করে ফেলি। সেখান থেকে আমাদের এনার্জি পাওয়া দরকার। সেই মুহূর্তগুলোকে উপভোগ করা দরকার। যদি বাইরের আবহাওয়া ও পরিবেশ ভালো থাকে, তাহলে সেটা উপভোগ করুন। বাসায় এসে বাবা-মার সাথে একসাথে বসে গল্প-গুজব করুন। বাচ্চাদের সাথে খেলা করুন অথবা তাদেরকে নিয়ে বাইরে ঘুরতে যান। বাইরের প্রকৃতিকে ভালো করে খেয়াল করুন। যারা জীবনে সফল, তারা এই সুখের মুহূর্তগুলো তৈরি করে। সেগুলোকে খুঁজতে থাকে। আর সেগুলো থেকে এনার্জি নিতে থাকে।

৬) মানুষের উপকার করুন

রাসূল সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

"আল্লাহর কাছে সে লোকই উত্তম, যারা মানুষদের উপকার করে। আল্লাহর কাছে সর্বোত্তম কাজ হচ্ছে কোনো মুসলিম ভাইকে খুশি করা অথবা তার দুঃখ-কষ্ট দূর করে দেয়া অথবা তার ঋণ মাফ করে দেওয়া অথবা ক্ষুধার্তকে খাবার খাওয়ানো।"[৭]

---

[৭] আল মুজামুল ওয়াসিত, ৬০২৬

কোন একটা মানুষ যদি হতাশগ্রস্ত থাকে, তাকে ভরসা দিন, কাউন্সিলিং করুন। দ্বীনের কথা বলুন, যাতে সে খুশি হয়ে যায়। এসব লোকদেরকে আল্লাহ অনেক পছন্দ করেন। মানুষদের সেবা করার এই গুণ যখন আমরা নিজেদের ভেতরে আনতে পারবো, তখন আমরা নিজেরাও অনেক সুখে থাকবো।

৭) গ্যাজেটের পরিবর্তে প্রকৃতির সাথে সময় কাটান

সর্বশেষ কবে মনযোগ সহকারে আকাশের তারা দেখেছিলেন? এটা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে যখন আপনি প্রকৃতির সাথে সময় কাটাবেন, আকাশকে ভালো করে খেয়াল করবেন, আকাশের তারাগুলো দেখবেন, তখন অন্তত একটু হলেও শান্তি অনুভব করবেন। কিন্তু তার পরিবর্তে আমরা সব সময় ঐ নয় ইঞ্চি স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে থাকি। আমাদের দুনিয়াটা এখন ঐ নয় ইঞ্চি স্ক্রিনের মধ্যে আটকে গেছে। সেদিকেই আমরা সবসময় তাকিয়ে থাকি। বছরের নির্দিষ্ট একটা সময় বের করুন, যে সময় আপনি শুধু প্রকৃতির কাছে যাবেন। অবশ্যই আপনার গ্যাজেটস ঐখানে গিয়ে ব্যবহার করবেন না। যদি ঐখানে গিয়ে আপনার উদ্দেশ্য থাকে শুধু ছবি তুলে আর ভিডিও করে ফেসবুকে আপলোড করবেন, তাহলে আপনার যাওয়ার আসল উদ্দেশ্যই ব্যাহত হবে। যতই প্রকৃতির সাথে আপনার সম্পর্ক গভীর হবে, ততই বাস্তবমুখী হবেন। আপনার মন-মানসিকতা বিশাল হবে।

সুখে থাকার সবচেয়ে বড় উপায়

আপনি যদি শুধু এটাই করেন, তাহলে এটার কারণে বাকি গুণগুলো আপনার মধ্যে চলে আসবে। আর সেটা হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার জিকির করা। হতাশার মুহূর্তগুলোতে আপনি যতই আল্লাহর জিকির করবেন, ততই আপনার হতাশাবোধ কমতে থাকবে। ঐ মুহূর্তগুলোতে আপনি যতই গুনাহের দিকে যাবেন, ততই আপনার হতাশা বাড়তে থাকবে। রাগের মুহূর্তগুলোতে আপনি যত আল্লাহকে স্মরণ করবেন, আপনার রাগ তত কমে যাবে। সেই সাথে আপনি যে সমস্যার মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন, সেটাও আল্লাহ সমাধান করে দিবেন।

আল্লাহ কুরআনে বলেন:

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ

> "সুতরাং তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমিও তোমাদের স্মরণ রাখবো এবং আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর; অকৃতজ্ঞ হয়ো না।" (সূরাহ বাকারা, ২:১৫২)

আল্লাহর জিকির করার মানে হচ্ছে নামাজ পড়া এবং আল্লাহ যে ফরয, ওয়াজিব বিধানগুলো দিয়েছেন, সেগুলো ঠিকঠাকমতো পালন করা। আর সবচেয়ে উত্তম জিকির কুরআন পড়া। তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেসব জিকির-আজকার ও তাসবীহ পড়তে বলেছেন, সেগুলো নিয়মিত পড়া। আল্লাহ তাআলার আদেশ ও নিষেধগুলো মেনে চলা, মানুষদেরকে আল্লাহর কথা বলা— এগুলো সবই জিকিরের অন্তর্ভুক্ত।

আল্লাহ বলেন, যদি আপনি আল্লাহকে স্মরণ করেন, তিনি অবশ্যই আপনাকে স্মরণে রাখবেন। মুফাসসিরগণ বলেন, এটা এত বড় কথা যে, শুধু এটার ব্যাপারে ভাবলেই আর কোনো দুঃখ থাকার কথা না।

ডিপ্রেশন

এখনকার সময়ে যে শব্দগুলো সবচেয়ে বেশি মিসইউজ হয়েছে, তার মধ্যে একটি হচ্ছে ডিপ্রেশন। মোটকথা "আমি ডিপ্রেশনে আছি" এটা বলাটা একটা ফ্যাশন হয়ে গেছে। এই কথাটা শুনে হয়তোবা অনেকের কাছেই অবাক লাগতে পারে। কারণ অনেকেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ডিপ্রেশনের স্টোরি শেয়ার করছেন এবং আজকালকার সময়ে এটা বেশিই শোনা যাচ্ছে। ডিপ্রেশন বলে কিছু নেই, তা না। ডিপ্রেশন বাস্তব এবং খুবই সিরিয়াস ইস্যু। কিন্তু এখনকার সময়ে ডিপ্রেশনের প্রভাব যতটা বেড়েছে, কিছুদিন আগেও সেটা এমন ছিল না। তাই ডিপ্রেশন আসলে জিনিসটা কী, সেটা আগে আমাদের বুঝতে হবে। দুঃখ, বিষাদের মতো আবেগীয় অনুভূতিগুলোকেই আমরা ডিপ্রেশন ভেবে বসে আছি।

আর রবার্ট প্যাডম্যান তার *ইন্ট্রোডাকশন টু সাইকোলজি* বইয়ের শেষের দিকে লিখেছিলেন, এই বই পুরোটা পড়ে হয়তো আপনার মনে হতে পারে আপনার নিজের মধ্যে এসব ডিসঅর্ডার আছে। কারণ এসব লক্ষণ সম্পর্কে আপনি যখন জানবেন, তখন আপনার নিজের কাছে মনে হবে "এসব লক্ষণ তো আমারও আছে। তাহলে আমিও অ্যাংজাইটি, ফোবিয়া, ডিপ্রেশনে আছি।" হ্যাঁ, কিছু লক্ষণ মিলে যেতে পারে। কিন্তু এইসব লক্ষণ যদি বারবার বা নিয়মিতভাবে দেখা যায়, তখনই কেবল সাইকোলজিস্টের সাথে যোগাযোগ করা উচিত। তারা ভালোভাবে ডায়াগনোসিস করে বলতে পারবে সেটা সাইকোলজিকাল ডিসঅর্ডার কি না।

আপনি হয়তো কিছু সময় ধরে দুঃখবোধ, লো স্পিরিট, ডিমোটিভেশন বা মর্মপীড়ায় ভুগছেন। কিন্তু তার মানে এই না যে, আপনি ডিপ্রেশনে ভুগছেন। ডিপ্রেশন হলো দুঃখবোধের চরম পর্যায়। এর সুনির্দিষ্ট কিছু লক্ষণ আছে।

ডিপ্রেশন দুই প্রকার: Existential এবং Clinical.

অনেককেই বলতে শোনা যায় মুমিনের কখনো ডিপ্রেশন হয় না। কথাটা অস্তিত্বগত (Existential) ডিপ্রেশনের ক্ষেত্রে বলা হলে ঠিক আছে। অস্তিত্বগত ডিপ্রেশন Existential crisis এর কারণে হয়। সাইকোলজিস্টরা Existential crisis সংজ্ঞায়িত করেছেন এভাবে,

> *Existential crisis, also known as existential dread, are moments when individuals question whether their lives have meaning, purpose, or value, and are negatively impacted by the contemplation*

(https://en.wikipedia.org/wiki/Existential_crisis)

অস্তিত্বগত ডিপ্রেশনে তারাই যায়, যারা জীবনের উদ্দেশ্য জানে না। এই যে পৃথিবীতে তার অস্তিত্ব, এটার কোনো অর্থই দেখে না তারা। এই যে অণু-পরমাণুর ঠোকাঠুকি আর বিস্ফোরণের ফলে হঠাৎ 'প্রাণ' নামক একটা ব্যাখ্যাতীত জিনিসের উদ্ভব হলো, গোটা ব্যাপারটাই তাদের কাছে লাগে উদ্ভট, meaningless.

পক্ষান্তরে ইসলামে মানবজীবনের অস্তিত্বের উদ্দেশ্য খুবই স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত। এই বিশ্বজগৎ পরীক্ষাক্ষেত্র, যার ফলাফল মিলবে পরকালে। আল্লাহ তা'আলা জীবন, সম্পদ এবং জানমালের ক্ষতি দিয়ে আমাদেরকে পরীক্ষা করবেন। এই পরীক্ষার মাধ্যমে জানা যায় কে বেশি ঈমানদার, কে আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করে এবং কারা এই বিপদে অটল থাকে। আপনার সামনে যদি আখিরাত এবং তাকদিরের কোনো ধারণাই না থাকে, দুনিয়ার হাকীকত সম্পর্কে না জেনে থাকেন এবং দুনিয়ার জীবনকেই একমাত্র জীবন মনে করে থাকেন, তখন অস্তিত্বগত ডিপ্রেশন তো আসবেই।

মিউজিক এবং ওয়েব সিরিজ দিয়ে তো আর অস্তিত্বের উদ্দেশ্যের ব্যাখ্যা মেলে না। একটা সময় আসে, যখন এসকল সাময়িক বিনোদন মানুষকে আর বিনোদন দেয় না। একটা সময় সে নিজেকে নিজেই বলে, "আমি আসলে কী করছি? মানে আমি কতটুকু পর্যন্ত এন্টারটেইনমেন্ট দেখতে থাকব? এগুলোর শেষ কোথায়?"

তাই অস্তিত্বগত ডিপ্রেশন স্বভাবতই কাফিরদের, বিশেষত নিরীশ্বরবাদীদের বৈশিষ্ট্য। মুমিন তো সে-ই, যে ঈমান নিয়ে এসেছে এবং সে অনুযায়ী আমল করে। যে নিয়মিত আল্লাহ তাআলার ইবাদাত করে এবং খুশু-খুজু নিয়ে নামাজ পড়ার

চেষ্টা করে। তাই আমরা বলি মুমিনের কখনো অস্তিত্বগত ডিপ্রেশন হতে পারে না। মুমিনের সামনে একটা বড় লক্ষ্য সেট করা থাকে। সে বড় বড় বিপদ আপদ মোকাবেলা করবে এই ভেবে যে, এটা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে পরীক্ষা করা হচ্ছে।

মুমিন ব্যক্তিও দুনিয়াবী দুঃখ-বেদনা থেকে আঘাত পায়। কিন্তু সে কখনো এটা ভাবে না, "আমি আত্মহত্যা করে ফেলবো" বা "আমার জীবনে উদ্দেশ্যটা কী?" অথবা "আমার জীবনের মিনিং কী?" মিনিং তো সে অলরেডি জানেই। এটা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে পরীক্ষা এবং এর বিনিময়ে ধৈর্যধারণ করা হলে আখিরাতে পুরস্কার পাওয়া যাবে। আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতে তার মর্যাদা বাড়িয়ে দেবেন। এটাই তার তাকদিরে নির্ধারিত করা ছিল এবং সেটাই হয়েছে।

দ্বিতীয় প্রকারটি হচ্ছে ক্লিনিক্যাল ডিপ্রেশন। ক্লিনিক্যাল ডিপ্রেশন মুমিনেরও হতে পারে। সেটা হতে পারে বায়োলজিক্যাল কোনো কারণে বা ব্রেইনের বিভিন্ন স্ট্রাকচারের কারণে। বা হতে পারে বংশগত কারণে। নিউরোসাইন্স আমাদেরকে এটা বলছে যে আপনার ব্রেনের স্টাকচারের উপর নির্ভর করে বিভিন্ন রকমের সাইকোলজিকাল ডিসঅর্ডার হতে পারে। নিউরোট্রান্সমিটার বা হরমোন অনুপস্থিতির কারণে ডিপ্রেশন হতে পারে। সেরোটোনিন, ডোপামিনের অভাবেও হতে পারে এই রোগ। সাবালকত্ব, গর্ভধারণ, ঋতুস্রাব ইত্যাদি শারীরবৃত্তিক পরিবর্তনগুলোর সময় হরমোনাল ইমব্যালেন্সের ফলে আসলেই ডিপ্রেশন হয়। তাই অর্ধেক কথা না বলে পুরো কথাটা বলা উচিত। হতে পারে অনেক দ্বীনদার মানুষ ডিপ্রেশনে আছে। কিন্তু সেটির পেছনের কারণ অবশ্যই অস্তিত্বগত ডিপ্রেশন নয়। সে এইজন্য ডিপ্রেসড না যে, তার জীবনের কোনো অর্থ খুঁজে পাচ্ছে না।

এখনকার সময়ে বিশেষত পশ্চিমা সমাজে যেটা অনেক বেশি দেখা যাচ্ছে, সেটা অস্তিত্বগত ডিপ্রেশন। কারণ সেখানে তাদের অন্তরকে পরিতৃপ্ত করার, তাদেরকে অন্ধকার থেকে বের করে আনার মতো কোনোকিছুই নেই। তাদের কাছে আখিরাত নামে কোনো ধারণাই নেই। এই নাস্তিক্যবাদ তাদের উপরে অনেক জুলুম করেছে। আজ সৃষ্টিকর্তার ধারণা তাদের জীবন থেকে কেড়ে নেয়া হয়েছে। ঐসব লোকদের ইসলাম সম্পর্কে জানিয়ে দেওয়া এখন আমাদের দায়িত্ব। তারাও আদম আলাইহি ওয়াসাল্লামের সন্তান এবং আমাদের মানবতার ভাই-বোন। তাই তাদের কাছে আমাদের ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দিতে হবে।

পশ্চিমা, ধর্মহীন, আধুনিক মানুষেরা অস্তিত্বগত ডিপ্রেশনে ভুগছে বলেই ডিপ্রেশন এখন ফ্যাশান। অন্ধ অনুকরণকারীরা ডিপ্রেশনকে একটা প্রিভিলেজ মনে করে, যেহেতু 'উন্নত' জীবনযাত্রার মানুষেরাই এতে ভোগে বেশি। সোশ্যাল মিডিয়াভর্তি এত এত ডিপ্রেশনের স্টোরির পেছনে এটাই আসল কারণ। তারা সাধারণ দুঃখগুলোকেই ডিপ্রেশন ভেবে বসে আছে।

নিজেকে ডিপ্রেসড ভাবার ফলে আমাদের কী ক্ষতি হয়? এর ফলে আমাদের ব্রেইনে ভুল মেসেজ যায়। মানুষ নিজেকে রোগী ভাবে। ফলে যেকোনোকিছুতে সহজে হাল ছেড়ে দেয়। আর এটাই শয়তানের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার।

ইমাম ইবনুল কাইয়িম রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, একজন হতাশ ঈমানদার শয়তানের কাছে সবচেয়ে প্রিয়। কারণ হতাশ মুমিনকে সে সহজেই পথভ্রষ্ট করতে পারে। আল্লাহর ইবাদাত থেকে দূরে রাখতে পারে। আমি মানুষদেরকে প্রায়ই দেখি যে তাদের জীবনে কিছু উথাল-পাতাল চলছে, ঘরের কারো সাথে কোনো মনোমালিন্য চলছে, তাছাড়া বিভিন্ন কাজের স্ট্রেস তো আছেই। তাদের উপর যে দায়িত্বগুলো থাকে, সেগুলো তারা ঠিকঠাকমতো পালন করছে না। ফলে সহজেই তারা ডিপ্রেশনে চলে যায়। আর এটাই তাদের নামাজে প্রভাব ফেলে। তারা নামাজে আগের মতো মজা পায় না।

বিশেষ করে আমাদের তরুণদের দেখুন। সঠিক ইসলামি শিক্ষা ও ম্যাচুরিটির অভাবে তারা যেকোনো আচমকা আবেগকে প্রেম-ভালোবাসা ভেবে বসে। তারপর প্রেমের মানুষটার সাথে কোনো ব্যাপারে মনোমালিন্য হলে সেখান থেকে আসে স্যাডনেস আর ডিমোটিভেশন। শয়তানও এই অবস্থারই ফায়দা লোটে। তরুণটি অসামাজিক হয়ে যায় এবং নিজেকে রুমের মধ্যে সারাদিন বন্দি রাখে। তারপর চলে যায় ডিপ্রেশনে। অন্যদিকে বলিউডের স্যাড গানগুলো তো আছেই তার ডিপ্রেশনকে আরো বাড়িয়ে তোলার জন্য। তাই নিজের উপর রহম করুন। শয়তানের এই চালকে বোঝার চেষ্টা করুন। খুশি থাকতে শিখুন। খুশি থাকার চেষ্টা করার মাধ্যমেই মানুষ খুশি থাকতে পারে।

এত ঠুনকো কারণে যদি আপনার ডিপ্রেসড হওয়া লাগে, তাহলে ইউসুফ আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কী দোষ ছিল? তাঁকে তো কুয়ায় ফেলে দেয়া হয়েছিল। যখন সাহাবীদের উপর কোনো বিপদ-আপদ আসতো না, তখন তারা হয়রান হয়ে যেতেন। ভাবতেন, হয়তো আল্লাহ তাদের উপরে নারাজ হয়ে গেছেন। কারণ হাদীস অনুযায়ী আল্লাহ তা'আলা তাঁর পছন্দের বান্দাদের বিপদাপদ দেন।

বিশেষ করে পুরুষদের জন্য ডিপ্রেশন একেবারেই বেমানান। আপনিই যদি ডিমোটিভেটেড হয়ে বসে যান, তাহলে আপনার ঘরের বাকিদের অবস্থা কী হবে? আপনি তো ঘরের নেতা। তাই সামনে থেকে নেতৃত্ব দিন। জীবনে দুঃখ-দুর্দশা আসলে আল্লাহ তালার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করুন। নিশ্চয় কষ্টের সাথে স্বস্তি আছে। জীবনে যদি কষ্ট আসে, অবশ্যই তার সাথে স্বস্তিও আসবে। কিন্তু যদি কোনো সমস্যার সমাধান খুঁজে না পান, তাহলে ধৈর্য ধারণ করুন। আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করুন।

ডিপ্রেশনের লক্ষণ

ডিপ্রেশন হচ্ছে দুঃখবোধের দীর্ঘস্থায়ী অনুভূতি। তবে এর কিছু সাধারণ লক্ষণ আছে। সেগুলো হচ্ছে:

- দুঃখবোধ, কান্না, আশাহীনতা ও অন্তরের মধ্যে শূন্যতার অনুভূতি হওয়া।
- ছোট ছোট বিষয়ে রাগে ফেটে পড়া।
- ছোট ছোট বিষয়ে হতাশ হয়ে যাওয়া।
- দৈনন্দিন জীবনের অধিকাংশ অথবা ছোটখাটো বিষয় থেকে আগ্রহ হারিয়ে ফেলা, যেমন যৌনতা। এর ফলে বিবাহিত দম্পতিরা তাদের বিবাহের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলে।
- ঘুমের অনিয়ম। যেমন নিদ্রাহীনতা অথবা অতিরিক্ত ঘুমানো।
- ছোট ছোট কাজ করতে অতিরিক্ত এফোর্ট দেয়া।
- খাদ্যভাসের পরিবর্তন হওয়া। শরীরের ওজন কমে যাওয়া অথবা খাবারের প্রতি আকর্ষণ বেড়ে যাওয়া এবং ওজন বেড়ে যাওয়া।
- নিজেকে মূল্যহীন মনে করা।
- অতীতের কোনো ঘটনার ব্যাপারে নিজেকে সবসময় দোষারোপ করা।

- নিজেকে বঞ্চিত ভাবা। সবসময় এটা চিন্তা করা, "আমার সাথেই এরকম কেন হচ্ছে?"
- কোনোকিছুতে মনোযোগ দিতে, যেকোনো সিদ্ধান্ত নিতে ও কোনো কিছু মনে রাখতে সমস্যা হওয়া।
- আত্মহত্যা করার চিন্তা ভাবনা মাথায় আসা।

যদি এগুলোর মধ্যে একাধিক লক্ষণ কারো মধ্যে দেখা যায়, তখনই তাকে ডিপ্রেশনের ভুক্তভোগী বলা যায়। তা না হলে সেগুলো স্যাডনেস অথবা Grief-এর লক্ষণ এবং সেগুলো থেকে আপনি সহজেই বের হয়ে আসতে পারবেন।

ডিপ্রেশনের কারণ

১) সম্পর্ক

অনেক মানুষ রিলেশনশিপের জন্য ডিপ্রেশনে যায়। সে হয়তো কাউকে ভালবেসেছিল এবং পরে বিয়ে করতে চেয়েছিল। কিন্তু কোনোভাবে সেটা হয়নি। তখন সে ডিপ্রেশনে চলে যায়। অনেক সময় মা-বাবা বা বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়-স্বজনদের সাথে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে মনোমালিন্য চলে। শ্বশুর-শাশুড়ি ভালোমতো ট্রিট করেনি। স্বামী বা স্ত্রী ট্রিট করেনি। এজন্য অনেকে দুঃখে থাকে। আবার বৃদ্ধ বয়সে আসলে ছেলেমেয়েরা অনেক সময় ঠিকমতো দেখভাল করে না। মোটকথা রিলেশনশিপ মানুষকে দুঃখ দেয়।

২) আর্থিক কারণ

যখন কোনো মানুষ তার প্রত্যাশা অনুযায়ী জব পায় না, তখন সে ডিপ্রেশনে চলে যায়। ব্যবসায় বড় কোনো লস হয়ে গেলে বা এমন অবস্থায় আসলে যে ঘরে খাবারের কিছু নেই, তখন মানুষ ডিপ্রেশনে পড়ে যায়।

৩) অতীতের ঘটনা

আমি মনে করি অতীত নিয়ে দুশ্চিন্তা করা আমাদের ডিপ্রেশন হওয়ার অন্যতম বড় কারণ। আমরা অতীতের কোনো দুর্ঘটনা সহজে ভুলে যেতে পারি না। যেমন ডিভোর্সের স্মৃতি।

৪) ঘাটতির অনুভূতি

কেউ নিজেকে কোনো দিক দিয়ে অপূর্ণ বা ঘাটতির অধিকারী ভাবলে ডিপ্রেশনে পড়ে যায়। ধরুন একটা মানুষ টাক। পার্থিব দৃষ্টিতে এতটা সুন্দর না। (এমনিতে আল্লাহ তা'আলা সুন্দর করেই আমাদের বানিয়েছেন। এজন্য 'পার্থিব দৃষ্টিকোণে'র কথা বলা হলো।) মানুষের কাছে এটা নিয়ে অহরহ কথা শোনে। তখন তার ডিপ্রেসড হয়ে পড়ার সম্ভাবনা খুব বেশি। আমাদের স্কুল কলেজগামী বাচ্চারা বিশেষ করে মেয়েরা এটা নিয়ে অনেক ডিপ্রেসড থাকে। ব্র্যান্ড, অ্যাডভার্টাইজমেন্ট এবং বিলবোর্ড যদি এসব স্ট্যান্ডার্ড সেট করে না দিত, তাহলে তারা হয়তো এ নিয়ে অত মাথাই ঘামাত না।

সমাধান

প্রথমে রিলেশনশিপের ব্যাপারে একটি হাদীস উল্লেখ করছি। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

> "যে ব্যক্তি মানুষকে নারাজ করে আল্লাহর সন্তুষ্টি চায়, তার উপর আল্লাহ সন্তুষ্ট থাকেন, আর মানুষকেও তার প্রতি সন্তুষ্ট করে দেন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আল্লাহকে নারাজ করে মানুষের সন্তুষ্টি চায়, তার উপর আল্লাহও অসন্তুষ্ট হন এবং মানুষকেও তার প্রতি অসন্তুষ্ট করে দেন।"[৮]

এছাড়া আল্লাহ তা'আলা কুরআনে বলেছেন:

وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ ۗ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا

> "আমি তোমাদের এককে অপরের জন্যে পরীক্ষাস্বরূপ করেছি। দেখি, তোমরা সবর কর কি না। আপনার পালনকর্তা সবকিছু দেখেন।" (সূরাহ ফুরকান, ২৫:২০)

আল্লাহ তা'আলা সবই দেখছেন মানুষেরা কী করছে। তাই মানুষের আচরণে এতটা দুঃখ পাবেন না। আল্লাহ সবই জানেন। তাই আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করতে থাকুন, দেখবেন আপনার আশেপাশের মানুষেরা আপনার উপর সন্তুষ্ট হয়ে যাবে।

---

[৮] শারহুল আকীদা আল ওয়াসেতীয়াহ, হা/৩০৪।

আর রিজিকের ব্যাপারে রাসূল সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

> "আদম সন্তান যদি তার রিজিক থেকে পালিয়ে বেড়ায় ঠিক যেভাবে সে তার মৃত্যু থেকে পালিয়ে বেড়ায়, তবুও তার রিজিক তার কাছেই আসবে যেভাবে মৃত্যু তার কাছে আসে।"[৯]

রিজিকের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা কুরআনে বলেছেন:

وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا

وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ

> "আর যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্যে নিস্কৃতির পথ করে দেবেন। এবং তাকে তার ধারণাতীত জায়গা থেকে রিজিক দেবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে, তার জন্যে তিনিই যথেষ্ট। আল্লাহ তার কাজ পূর্ণ করবেন।" (সূরাহ তালাক, ৬৫:২,৩)

তার মানে এটা না যে, আপনি পরিশ্রম করা ছেড়ে দেবেন। এর মানে হচ্ছে আপনি শান্ত হয়ে যান। আপনি আপনার নির্ধারিত রিজিক অবশ্যই পাবেন। কিন্তু অবশ্যই পরিশ্রম করতে হবে এর জন্য। দোয়া ও মেহনত করা জারি রাখুন। হতে পারে আপনি যা চাইছেন, তার থেকেও ভালো জিনিস পেয়ে যাবেন। এভাবেই ইনশাআল্লাহ আর্থিক সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

আর অতীতের ঘটনার ব্যাপারে কুরআনের একটি আয়াত উল্লেখ করছি।

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

> "মনে রেখো যারা আল্লাহর বন্ধু, তাদের না কোনো ভয় ভীতি আছে, না তারা চিন্তান্বিত হবে।" (সূরাহ ইউনুস, ১০:৬২)

যখন আপনি আল্লাহর বন্ধু হয়ে যাবেন তখন আপনার অতীত এবং ভবিষ্যতের ব্যাপারে ভয়গুলো আপনা আপনি চলে যাবে। তাই আল্লাহকে আপনার বন্ধু বানিয়ে নিন।

---

[৯] হিল্‌ইয়াতুল আউলিয়া, ৭/৯০

ঘাটতির ব্যাপারে আসা যাক। আল্লাহ কুরআনে বলেন:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

"নিশ্চই আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি সুন্দরতম আকৃতিতে।" (সূরাহ তীন, ৯৫:৫)

আপনি আল্লাহর সৃষ্টি। নিজেকে কিছুতেই অসুন্দর বা ঘাটতির অধিকারী ভাববেন না।

কখনো শয়তানের বন্ধু হবেন না। শয়তান অবশ্যই আপনার ক্ষতি করবে, আপনাকে হতাশ করবে। আর নিজেকে বুস্ট করার চেষ্টা করুন। জীবনটাকে সুন্দরভাবে যাপন করতে শিখুন, খুশি থাকতে শিখুন। নিজের হেফাজত করুন। আপনার শরীরের আপনার উপর অধিকার আছে, আপনার মনেরও আপনার উপর অধিকার আছে। তাই দুঃখবোধ থেকে তাড়াতাড়ি ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করুন। তা না হলে এটা আপনার অভ্যাস হয়ে যাবে।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা, কখনো ডিপ্রেশনের মধ্যে পড়ে যাবেন না। কথায় কথায় ভাববেন না যে, আপনি শেষ হয়ে গেছেন। জীবনটা অনেক লম্বা। এখনো আপনার দ্বারা অনেক কিছু করার বাকি। যদি এখনই সাহস হারিয়ে ফেলেন, তাহলে কীভাবে হবে? তাই আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করুন। আল্লাহর সাহায্য নিয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করুন। আর দুঃখবোধ দূর করার দোয়াগুলো নিয়মিত পড়ুন। ইনশাআল্লাহ আল্লাহই আপনার সকল দুঃখ দূর করে দিবেন।

একটি ছোট্ট অনুরোধ

দ্বীনের মধ্যে হাসি মজা নিষেধ না। বিভিন্ন সময়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কেরামদের সঙ্গে হাসি-তামাশা করতেন। তবে রসিকতার মধ্যে কখনও মিথ্যা বা ধোঁকার আশ্রয় নিতেন না। সর্বদা সত্য ও বাস্তব বিষয়াদিতে রসিকতা করতেন। মিম বানানো, ভিডিও শেয়ার করা, বা নানারকম গ্রুপ-পেজ খোলাও স্বকীয়ভাবে হারাম কিছু না।

তবে...

আপনারা যদি সোশ্যাল মিডিয়ার দিকে দেখেন, অনেকে এমন সব গ্রুপ খোলে, যেখানে ছেলে মেয়ে একসাথে জয়েন করে, কমেন্টে হাসি-তামাশা করে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, তারা অশ্লীল আর ফাহেশা মিমের উপরে হাসাহাসি করছে। কিছু হাসিতামাশার মাঝে আবার রয়েছে প্রচ্ছন্ন কুফর ও শিরক! মানুষ বুঝতেই পারছে না যে, তারা কতটা ধ্বংসাত্মক কাজে জড়িয়ে গেছে।

তো এগুলো আমরা কিসের জন্য করছি? Just for what? হয়তো আমরা কিছু বেশি লাইক, শেয়ার আর রিয়্যাকশান পাবো বা ভাইরাল হয়ে ফেমাস হবো। তারপর হয়তো একে অপরকে বলবো, "জানো আমার এই পোস্ট এত শেয়ার হয়েছে।"

আবু মুসা আশআরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "তোমাদের সামনে ঘোর অন্ধকার রাতের মতো ফিতনা ঘটতে থাকবে। তাতে কোনো ব্যক্তি সকালে মুমিন ও বিকালে কাফের এবং বিকালে মুমিন ও সকালে কাফেরে পরিণত হতে থাকবে।"[১০]

---

[১০] মুসান্নাফে ইবনু আবি শাইবাহ: ১৩/৩৮৫, যুহদ লি ইমাম আহমাদ: ১৯৯

এটার সাথে সম্পর্কিত আরেকটি হাদীস আছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "কেয়ামত যখন কাছে চলে আসবে, তখন তোমাদের কেউ কেউ দুনিয়ার সামান্য সম্পদের বিনিময়ে তার দ্বীন ও ঈমান বিক্রি করে দিবে।"[১১]

তাই সবার আগে আল্লাহকে ভয় করুন। নিজেকে জিজ্ঞেস করুন। আপনার দ্বীন, ঈমান কোথায়? আপনি এটা কী করছেন? আপনি কি নিজে কখনো উপলব্ধি করেছেন, কোনটি হালাল কোনটি হারাম? কোন ধরনের মিম, ভিডিও শেয়ার করা উচিত? এই ছোট দুনিয়াবী ফায়দার জন্য আপনি হয়তো এখানে ফেমাস হয়ে যাবেন। কিন্তু আসমানে যে ফেরেশতারা আছেন এবং আমল লেখার জন্য যে দুজন ফেরেশতা আছেন, তাদের কাছে আপনার বদনাম হয়ে যাবে। এখানে না হয় আপনারা ফলোয়ার আর লাইকের সংখ্যা অনেক বেশি, কিন্তু কিয়ামতের দিন যখন আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুপারিশ প্রয়োজন হবে, তখন আমাদের কার সমর্থন আর ভালোবাসা কাজে আসবে?

তো প্রিয় ভাই ও বোনেরা, দুনিয়াতে কিছু ফায়দার জন্য এবং ফেমাস হওয়ার জন্য দ্বীনি এবং ইসলামী শিক্ষাকে আমরা এক পাশে সরিয়ে রাখি। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শিক্ষাকে আমরা একপাশে সরিয়ে রাখি। কোনো পেজ বা গ্রুপ খোলার সময় আমরা এটা দেখি না যে, এটা আসলে খোলা জায়েজ হবে কি না। আপনারা কোনো কিছু কেয়ার না করেই একটা জিনিস বানিয়ে ফেলেন। প্রতিদিন ফেরেশতারা আমাদের আমল নিয়ে উপরে উঠেন। আল্লাহ তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন যে, তাঁর বান্দারা কী করছে।

ফেরেশতারা আমাদের ব্যাপারে কী বলবে মনে হয়? "দুনিয়াতে বসে খারাপ ভিডিও শেয়ার করছে। মানুষকে হাসানোর জন্য মাথা খাটিয়ে পাপের উস্কানিমূলক মিম বানাচ্ছে। টিকটক, লাইকিতে অশ্লীল ভিডিও বানাচ্ছে। যাতে তাদের লাইক বাড়ে এবং মানুষের সামনে শো অফ করতে পারে।" আপনারা কি চান ফেরেশতারা আল্লাহর কাছে এসবই বলুক?

তাই আল্লাহকে ভয় করুন। নিজের প্রতি খেয়াল করুন এবং নিজের বিবেক-বুদ্ধি ভালোভাবে ব্যবহার করুন। আপনাকে অবশ্যই আল্লাহ তা'লার সামনা সামনি দাঁড়াতে হবে। যদি চান নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেয়ামতের দিন আপনার জন্য সুপারিশ করবেন, তাহলে অবশ্যই তাঁর সুন্নাহ ফলো করতে হবে।

---

[১১] তিরমিজী: ৫১২৫

তাই আপনাকে ভালো আর খারাপের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে হবে। দয়া করে কিছু দুনিয়াবী ফায়দার জন্য নিজের আখিরাত বরবাদ করবেন না। এটা সকলের প্রতি আমার বিনীত অনুরোধ।

ডোপামিনের দুনিয়ায়

আজকাল অনেক মা অভিযোগ করেন যে, তাদের বাচ্চারা এখন অলস হয়ে গেছে। যে কাজে কিছুটা পরিশ্রমের দরকার আছে, সে কাজগুলো করতে চায় না বা বিভিন্ন বাহানা দেখায়। যেমন নামাজ পড়া, ক্লাসের অ্যাসাইনমেন্ট করা, মা-বাবার কাজে একটু সাহায্য করা ইত্যাদি। এছাড়া তাদের মধ্যে কাজগুলোকে দেরী করে করার প্রবণতাও তৈরি হয়েছে।

আসলে বুঝতে হবে মানুষের এই ধরনের আচরণ তার বায়োকেমিস্ট্রির উপর নির্ভর করে। মানুষের মধ্যে কিছু হরমোন থাকে, যেগুলো তার আচরণকে প্রভাবিত করে। এর মধ্যে কিছু হরমোন হচ্ছে, ডোপামিন, কর্টিসল, অক্সিটোসিন, এন্ডোরফিন ইত্যাদি।

এখানে আমরা এক বিশেষ হরমোন নিয়ে আলোচনা করব। যদি আপনি ফিতনা থেকে বাঁচতে চান, তাহলে এই হরমোন কী এবং কীভাবে কাজ করে, সে সম্পর্কে আপনার অবশ্যই জানা আবশ্যক।

সেই হরমোনের নাম হচ্ছে "ডোপামিন"। ডোপামিন হচ্ছে এমন এক ধরনের কেমিকেল, যেটা আমাদের ডোপামিন সেন্টার থেকে রিলিজ হয়। যখন আমাদের শরীরে উত্তেজনা, কোনো কিছু অর্জন ও আনন্দের অনুভব করার প্রয়োজন হয়, তখন ডোপামিনের দরকার হয়।

আলেক্সান্ডার দি গ্রেট যখন পূর্ব থেকে পশ্চিম জয় করে আর আপনি যখন সমাজবিজ্ঞানে সর্বোচ্চ নাম্বার পান, দুটোর মধ্যে আসলে খুব একটা পার্থক্য নেই। বিল গেটসের আয় বা আপনার আয়ের আনন্দের কোনো পার্থক্য নেই। আমাদের ব্যথা পাওয়া, আনন্দ পাওয়া সব আসলে মস্তিষ্কের নিউরোট্রান্সমিটারের উপরে নির্ভরশীল। আনন্দের জন্য ডোপামিন বা সেরোটোনিন দুটো নিউরোট্রান্সমিটার।

এগুলো আমাদের মস্তিষ্কের স্নায়ুতে জমা থাকে। আপনি হিমালয় জয় করলেন বা অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পরে ফার্মগেটের বাস পেলেন, এসব আনন্দের ক্ষরণ হচ্ছে ডোপামিন। ডোপামিন ক্ষরণের উপরই আপনার আমার আনন্দ পাওয়া নির্ভর করে।

কথা হলো গ্যালন গ্যালন ডোপামিন জমা নেই আপনার মস্তিষ্কে। এটা বালতির পানির মতো। আপনি ঢেলে দিলেন, পরে বালতিটা পূর্ণ হবার জন্য আপনার অপেক্ষা করতে হয়। এজন্যই দেখবেন সব আনন্দই ক্ষণিকের। পুরনো স্মৃতি মনে করে ঘন্টার পর ঘন্টা হাসেন না। একবার ভালো খাবার খেয়ে আপনি সারাবছর খুশি থাকেন না। বাংলাদেশ একটা খেলা জিতলে আপনি এরপর দশবছর বিশবছর খুশি থাকেন না। কিছুক্ষণ পর খুশি মিলিয়ে যায়। তবে বহুদিন পর আবার মনে পড়লে তখন আবার আনন্দ অনুভূত হয়।

আরো উদাহরণ দিই। আপনি ভেবেছিলেন ভার্সিটিতে উঠলে সুখ আর সুখ। কিন্তু চান্স পাবার পর দেখলেন প্রথম পনেরো মিনিট সুখ পেলেন। এরপর আসলে আপনি বুঝতে পারছিলেন না, "এটাই কি সব? এটার জন্যই কি এতো যুদ্ধ করেছি? তাহলে অর্জনের পর এতোটা সাদামাটা লাগছে কেন?"

একটা কৌতুক শোনার পর দুই মিনিট হাসলেন, এরপর আস্তে আস্তে হাসি মিলিয়ে গেল। দ্বিতীয়বার একই কৌতুক শুনে আর তেমন হাসি পাবে না। এইখান থেকে আসে আনন্দের দ্বিতীয় পর্যায়। ডোপামিন এখন আর আগের মতো একই ব্যাপারে সাড়া দিচ্ছে না। ডোপামিন সব সময় আরো ইনপুট চায়, নইলে ক্ষরণ হয় না। অনেকটা একই কৌতুকে দুইবার না হাসার মতো। দেখবেন আপনি প্রথম মুখ দিয়ে আধো আধো বুলিতে "তাতা মামা" যা-ই বলেন না কেন, সবাই হইহুল্লোড় করে আনন্দ পেল, অথচ আস্তে আস্তে গা সওয়া হয়ে গেল। আর তখন হইহুল্লোড় যারা করেছিল, এখন তাদেরই প্রশ্ন "তুমি এত কথা বলো কেন?"

প্রথমবার যখন হামাগুড়ি দিচ্ছিলেন, বা কোনোমতে হেঁটে দু কদম পেরিয়েছেন, সবাই তালি আর তালি। কেউ আনন্দে কান্না করে দিল, কেউ দু'গাল বাড়িয়ে বললো আমার ছেলে এভারেস্ট জয় করবে। কিন্তু কদিন পরে এটাই হয়ে গেল, "এতো টই টই করে বেড়াও কেন?"

প্রতিনিয়ত ডোপামিন আনন্দের চাহিদা বৃদ্ধি করে। একই পরিমাণ আনন্দ পেতে একই জিনিস নতুন মাত্রায় করতে হয়। প্রতিদিন নতুন কিছু বা নতুন মাত্রা যোগ করতে হয় তাতে। ভালো লাগার অনুভূতির সাথে এভাবে ডোপামিন জড়িত। একই

জিনিস বারবার হলে ডোপামিন ক্ষরণের জন্য সেলগুলো ট্রিগার্ড হয় না। নতুন মাত্রা যোগ হলেই আমরা আনন্দ পাই। এ জন্য যারা ডিপ্রেশনে যায়, তাদেরকে সাইকিয়াট্রিস্ট ডোপামিনের ওষুধ দেয়। এতে করে সে উত্তেজনা, হ্যাপি অনুভব করে।

কিন্তু আনন্দ পেলে সমস্যা কই? সমস্যা হচ্ছে ডোপামিন একটা চক্রের সৃষ্টি করে। প্রথম দিন একটা সিগারেট দিয়ে শুরু, বছর ঘুরতে দিনে এক প্যাকেটে পৌঁছে গেল। কারণ ডোপামিন আপনার মধ্যে এই তাড়না বা অভাববোধ সৃষ্টি করে। ওই যে, প্রতিদিন মাত্রা বৃদ্ধি করা লাগে। একই ডোজে ডোপামিন আর নিঃসৃত হয় না। একদিন অবাক হয়ে খেয়াল করবেন ২০-২৫টি সিগারেটের পরও সেইভাবে আগের মতো আনন্দ পাচ্ছেন না। কারণ কী? ডোপামিন অসীম জমা নেই আপনার-আমার মস্তিষ্কে। তাই যা ছিল, তা ফুরিয়ে গেলে হাজার চেষ্টাতেও আনন্দ পাওয়া যায় না। কিন্তু ডোপামিনের মাধ্যমে আপনার শরীরে একটা চাহিদা তৈরি করেছেন আপনি নিজেই প্রথমবার যখন সিগারেট খেয়েছেন, ঠিক তখনই। তাই ডোপামিন এই যে আনন্দের চাহিদা জানান দিচ্ছে, সেই আনন্দ পেতেই হবে। ডোপামিন আপনাকে আনন্দ খুঁজে হাতড়াতে বাধ্য করে। আপনি এক জায়গা থেকে অন্য জায়গা হাতড়ে বেড়ান। আপনি আরো গভীরে যান। আরো গভীরে। আরো গভীরে। সিগারেটের উদাহরণই ধরি! বন্ধুদের সাথে দেখাদেখি শুরু করেছিলেন। অথচ অতলে হারাতে হারাতে ডোপামিনটা নিঃস্ব করলেন। তারপর সিগারেট থেকে মদ, গাঁজা আরো কত কী!! আনন্দ খুঁজতে খুঁজতে, আনন্দ হাতড়াতে হাতড়াতে ক্লান্ত হয়ে একসময় নিজেকে আবিষ্কার করলেন হাসপাতালের আইসিউতে। অথচ সেদিনের কোনো বন্ধু এলো না দেখা দিতে। কেউ আগেই পরপারে, কেউবা অন্য কোনো হাসপাতালে থাকবে আজ বা কাল....আফসোস!

একই বিষয় হয় মুভির ক্ষেত্রে। আপনার ভালো লাগা শুরু হবে একটা দিয়ে। এরপর ভাল লাগার কথা সবাই কে বলবেন। চায়ের টেবিলে বসে আড্ডা দিতে দিতে বলবেন টম ক্রুজের কথা। কিন্তু প্রতিদিন তো আর আপনার জন্য মুভি বেরুবে না। আপনি দেখবেন; একই রকম আরেকটা দেখবেন; আরেকটা। একসময় ভোঁতা হয়ে যাবে ডোপামিনের সেলগুলো। এরপর শুরু আপনার নতুন কিছু হাতড়ে বেড়ানো। আনন্দের খোঁজে অখাদ্য ঘরানার থেকে শুরু করে সবকিছু দেখছেন। সমস্ত ট্রেন্ড ফলো করছেন। কিন্তু আনন্দ পাচ্ছেন না!! আনন্দ কোথায় যেন হারিয়ে যাচ্ছে। বুঝতেও পারছেন না। আপনি একা নন। একবিংশ শতকে এসে সায়েন্স অফ ওয়েলবিং এতোটা নাড়া দিয়ে উঠলো কেন? সবাই কেন

বলাবলি করছে, "আমার সব আছে, তবু কিচ্ছু ভাল লাগে না।" কেন? কেন? কেন??? মনে প্রশ্ন জাগে না? বিজ্ঞান প্রযুক্তি যখন গাড়িবাড়ি, এসি, টিভি, ইন্টারনেট ইত্যাদি সুখের সবকিছু আপনার কোলে ঢেলে দিলো, ঠিক যুগের সেই সময়টাতেই WHO এর মতে, ২৬৪ মিলিয়ন মানুষ কেন ডিপ্রেশনে আক্রান্ত হয়? কেন সব থাকার পরও সব ছেড়ে প্রতিবছর ৮ লাখ মানুষ বিশ্বব্যাপী আত্মহত্যা করে? অতলে হারাবার আগেই ভাবুন।

পর্নোগ্রাফি, গেমিং, সোশ্যাল মিডিয়া ও স্মার্টফোন:

"ফ্রেন্ড সার্কেলের সবাই তো গেম খেলে। আমি না খেললে কেমন দেখায়! টাইম পাসের জন্য না হয় অল্প একটু গেম খেললাম আমি!" জাস্ট এমন কিছু ভেবেই প্রজন্মের বড় একটা অংশ গেমিং ট্রেন্ডের অবাধ জলে নাকানি চুবানি খেয়ে বেড়াচ্ছে। বর্তমানে মাদক জুয়া বা অন্যান্য নেশার মতো অনলাইন, অফলাইন গেমিং ও শিশু-কিশোর ও বিশেষ করে যুবকদের মাঝে নেশায় পরিণত হয়েছে। লক্ষ করা যাচ্ছে, কলেজ ভার্সিটি ফাঁকি দিয়ে বন্ধুরা মিলে ঘন্টার পর ঘন্টা গেম খেলে কাটিয়ে দিচ্ছে। গ্রামের রাস্তায় বের হলেই দেখা যায় যুবক ছেলেরা যাদের এখনো পড়ালেখা বা অন্য কোন প্রোডাক্টিভ কাজে থাকার কথা, তারা বসে বসে ঘন্টার পর ঘন্টা গেম খেলে কাটিয়ে দিচ্ছে। এর জন্য খাওয়া-দাওয়া, গোসল, নামাজ কোন কিছুই ঠিকমতো হচ্ছে না। কারণ গেমগুলোতে রিওয়ার্ড, পয়েন্টস ও বিভিন্ন লেভেল থাকে। যে জিনিসটা আপনাকে রিওয়ার্ড দেবে, সেটাই আপনাকে আলটিমেটলি ডোপামিনই দিবে। ফলে যতক্ষণ না পর্যন্ত সে গেমের এক লেভেল থেকে নতুন লেভেলে যেতে পারছে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে ডোপামিনের তাড়নায় গেম খেলতেই থাকে, খেলতেই থাকে!

ইয়াং জেনারেশনের মধ্যে টিভি সিরিজ দেখাটা এবং ফেসবুকে সে সিরিজ দেখার খবর জানানো এখন এক পপুলার ট্রেন্ডে পরিণত হয়েছে। তারপর টিভি সিরিজ দেখা শেষ হলে ফেসবুকে চলে বিভিন্ন ক্যারেক্টারের অভিনয় নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ আর সেই টিভি সিরিজের বিভিন্ন মিম শেয়ারিং। আপনি এসবকিছু ফেসবুকে দেখেন, আর ভাবেন,

"ইশ্! এই টিভি সিরিজটা এত ভালো হইসে! এইটা তো অবশ্যই দেখতে হবে।"

তারপর সেই সিরিজের প্রথম এপিসোড দেখা শুরু করলেন, আপনার ডোপামিন সেন্টারগুলো খুলে গেল, আপনি আনন্দ পেতে শুরু করলেন। এক এপিসোড শেষ করে আরেক এপিসোড না দেখা পর্যন্ত ডোপ সেন্টারগুলো খোলা থাকবে এবং পুরো সিজন শেষ না করা পর্যন্ত আপনাকে বিরক্ত করবে । ফলে আপনি পুরো সিজন শেষ না করা পর্যন্ত উঠতে পারেন না এবং আপনার ঘুমও ঠিকমত আসে না। এর ফলে অনেক মানুষ সারা রাত ধরে একটার পর একটা টিভি সিরিজ দেখতেই থাকে এবং কখন যে রাত শেষ হয়ে যায়, সেটা টেরই পায় না। ফলে সকালে আমাদের ঘুম থেকে উঠতে দেরি হয় আর ফযরের নামাজ অফিস/ক্লাসগুলো মিস/লেট হয়।

আরেকটি বিষয় হচ্ছে স্মার্টফোনের অতিরিক্ত ব্যবহার। আপনি যদি ফেসবুকে নতুন কোনো প্রোফাইল পিকচার দেন এবং তাতে ফ্রেন্ড-ফলোয়ারদের লাইক-রিয়্যাকশান পান, তা আপনার খুবই ভালো লাগে। আপনার self-esteem বাড়ে। মনে হয় জীবনে যেন কিছু একটা অর্জন করে ফেলেছেন। এই জিনিসটাই আপনাকে ডোপামিন দিচ্ছে। এবং শুধু ডোপামিনই দিচ্ছে, আর কিছুই না। এভাবেই মানুষ সোশ্যাল মিডিয়ার ধোঁকায় পড়ে যাচ্ছে।

পর্নোগ্রাফির জগত সবাইকে ভাসিয়ে নিয়ে যায় সেই ডোপামিনের মহাসাগরে। সুখ আর সুখ! কিন্তু কিছুক্ষণ পর ডোপামিন শেষ হয়ে যায়। তখন শুরু হয় মানসিক ক্লান্তি, অপরাধবোধ, অবসন্নতা। কিন্তু ডোপামিন নেশার চক্র সৃষ্টি করে। পরেরবার আবার টেনে নিয়ে যাবে একই পথে। সবাই জানে এই সুখ ক্ষণিকের, এরপর সুতীব্র অবসাদ। তবুও "এইবারই শেষ বার বলে" সবাই আবার যায়। কিন্তু ডোপামিন আগের ডোজে আর খুশি থাকে না। স্টিমুলেশনের জন্য অন্য কিছু লাগে বা আরেকটু বেশি ডোজের দরকার হয়। হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ পর্ন কালেকশন আপনার জন্য রাখা হয়েছে। আপনি বিচরণ করতে পারেন চাইলেই। ডোপামিনের ডিমান্ড বাড়তে থাকে। এক ক্যাটাগরি থেকে আরেক ক্যাটাগরিতে বিচরণ করেন। এই পাওয়ারফুল ডোপামিনের নেশায় আসক্ত হয়ে পড়েন। গভীরেই যেতে থাকেন। অতল এক গহ্বরে হারিয়ে যান!

লাভ ম্যারেজ অ্যান্ড ডোপামিন:

আপনি যদি ডোপামিনের দাসত্বে পতিত না হন, তাহলে দাম্পত্য জীবন সুখের হতে বাধ্য। কিন্তু আফসোস! আর্লি ম্যারেজে সমাজের বাধা, প্রেম করার ট্রেন্ড, বিভিন্ন দিবসে শাড়ি পাঞ্জাবি পরে ছবি দেবার মতো ছোটলোকি ট্রেন্ড ফলো করার জন্য বর্তমান জেনারেশন প্রায় পুরোটাই প্রেম করে। আবার প্রেম করে তো আর সব চাহিদা মেটানো যায় না। তখন ফেরত যায় ইন্টারনেটে।

প্রেম করে বিয়ে করলেন। তাতে তো হয়, নাকি? কিন্তু সমস্যা দুইদিকে। এক. প্রেম হচ্ছে ডোপামিনের ক্ষরণ। সিগারেট বা হেরোইনের মতো। প্রতিনিয়ত আপনার ডিমান্ড বাড়াচ্ছে। বিয়ের পর আপনার মস্তিষ্কে ডিমান্ড আকাশচুম্বী। কিন্তু প্রেম করার পর বিয়ে করলে নতুন কিছু যোগ করতে বাকি নেই। ডোপামিনের যে বাড়তি ডিমান্ড, তা আপনি পূরণ করতে পারছেন না। ফলে দাম্পত্য-কলহ শুরু।

এই "ভালোবাসার সাগরে ভেসে থাকা"র দশকে হঠাৎ ডিভোর্সের হার তিনগুণ হলো কেন, আমরা কেউ জানতে চাই না। মা বাবার বাছাই করা সুপ্রতিষ্ঠিত সুপাত্র কেন বছর ঘুরতেই বিষাক্ত হয়ে ওঠে? বিয়ের সময় ২৮ বছর বয়সে পর্ন, প্রেমের বদৌলতে ডোপামিনের ডিমান্ডের দশা কি আর চাকরির হালনাগাদে লেখা থাকে? প্রশ্নই আসে না! ১৫ বছরে বয়োপ্রাপ্ত হওয়া ছেলে বাকি ২৮ বছরে বিয়ে করছে। ১৩ বছর কেমনে পার করলো? মনে হতে পারে, "ধুর আমার ওসব হবে না। সেল্ফ কন্ট্রোল থাকলে এতো ক্ষতি হয় না। অল্পস্বল্প একটু আধটু হোক তাতে ক্ষতি কি? লাগাম ধরে রাখলেই হলো।" আপাতদৃষ্টিতে কোনো ক্ষতির হিসেব চোখে দেখা যায় না। শুধু বোঝা যায় যে কিছু একটা পরিবর্তন হচ্ছে। পরে অনেকদিন পর হঠাৎ মনে হয়, সবকিছু এতো এলোমেলো কীভাবে হলো? কখন হলো? কেন হলো? তখন বুঝতে পারা যায়। কিন্তু ছাই হবার পর কি আর কিছু ফেরত আসে? আগুন যখন লাগছিল তখন যদি ভাবতেন, তাতে কি আর সাম্রাজ্য ধ্বংস হতো আপনার!

মানুষের উপর অতিরিক্ত ডোপামিনের প্রভাব:

কাজে দেরি করার প্রবণতা: প্রতিদিনই মনে হতো "আগামীকালকে করবো।" কিন্তু এভাবে কাজটা আর হয়ে ওঠে না। যেমন আজকালকার ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে এই প্রবণতা বেশি দেখা যায়। পরীক্ষার যদি এক মাস বাকি থাকে, তখন নিজেকে

প্রবোধ দেয়, "পরীক্ষার মেলা দেরী, তাই এখন কোনো টিভি সিরিজ বা গেম খেলা যাক।" এভাবে করেই পরীক্ষার সময় কাছে ঘনিয়ে আসে।

অলসতা: পরিশ্রম করার অভ্যাসটা চলে যায়। কারণ ডোপামিন আপনাকে তাৎক্ষনিক মজা দেয়। আজকাল আমরা পরিশ্রম করা ছেড়ে দিয়েছি, এজন্যই আমরা ডোপামিনের নেশার শিকার হয়ে গেছি।

ডোপ সোর্সের সাথে অতিরিক্ত অ্যাটাচমেন্ট: যেমন স্মার্টফোন, গেমিং, সোশ্যাল মিডিয়া। মানুষের ইচ্ছা হয় যেন, শান্তিমতো কোথাও বসে সারাদিন ধরে যেন এগুলোই ব্যবহার করতে থাকে।

স্বার্থপরতা: মানুষ শুধু নিজের ব্যাপারেই ভাবনা চিন্তা করতে থাকে।

অস্থিরতা: স্মার্টফোন, গ্যাজেট যতক্ষণ না ব্যবহার করছে ততক্ষণ পর্যন্ত অস্থির থাকে। যেসব কাজ করতে ধৈর্য, ফোকাসড থাকা প্রয়োজন হয়, সেসব কাজ মানুষ অ্যাভয়েড করে।

কমফোর্ট জোনে আবদ্ধতা: যার ডোপের পরিমাণ যত বেশি, সে ততো বেশি কমফোর্ট জোনের শিকার হয়। মানুষের self-development কখনো কমফোর্ট জোনের ভেতরে হয় না। দ্বীন বা দুনিয়া যেকোনো খানেই বড় কিছু পেতে গেলে অবশ্যই পরিশ্রম করা লাগে এবং কমফোর্ট জোন থেকে বের হতে হবে। দুনিয়াতে যারা পরিশ্রম করে, রিস্ক নেয়, দিন শেষে তারাই বড় কিছু করতে পারে।

আবেগহীনতা: এখনকার তরুণ প্রজন্ম আগের চেয়ে অনেক কম ইমোশনাল হয়ে গেছে। যেকোনো ইমোশনাল বিষয়কে তারা হেসেই উড়িয়ে দিতে জানে। তাদের অন্তরে তা কোনো প্রভাব ফেলে না। আগে একটা সময় মানুষ হাদীস বা কুরআনের আয়াত পড়ে অনেক কান্না করতো। এখনকার মানুষরাও করে। কিন্তু সেটা আসলে দিনে দিনে অনেক কমে যাচ্ছে আর এখনকার যুবকদের অবস্থা তো আপনার চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছেন।

তাহলে প্রতিকার?

ইসলাম অত্যন্ত সুন্দর একটি জীবন ব্যবস্থা। যত গভীরে জানি, ততোই অবাক হই। মদপানের একটা উদাহরণ দিয়েই বোঝাই। মদপান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নবুয়াতের শুরুর দিকে হারাম ছিল না। কম বেশি সবাই মদপান করতো। মদপান করার ফলে শরীরে একটা ডিপেন্ডেন্সি তৈরি হয়। যার ফলে দীর্ঘকাল মদপান করা ব্যক্তির হঠাৎ মদ ছাড়ার ফলে *উইথড্রওয়াল সিম্পটমস্* দেখা দেয়। খিঁচুনী হয়, শরীরে তীব্র আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হয় মদ্যপানের। এজন্য যারা ক্রনিক অ্যালকোহোলিক রিহ্যাব সেন্টারগুলোতে যায়, তাদের আস্তে আস্তে দফায় দফায় ডোজ কমিয়ে সুস্থ করা হয়। খুব অবাক হই যখন দেখি ইসলামে মদপানকে একধাপে হারাম করেনি। বেশ কয়েক ধাপে হারাম করা হয়েছে। কি সুন্দর, তাই না!

কিন্তু ঠিক ইসলামেই অপরদিকে জিনার উদাহরণ দেখুন। এক্ষেত্রে নিষেধের কড়াকড়ি। একদম ধারে কাছে যেতেই নিষেধ করেছে। এবার চিন্তা করে দেখুন: প্রথমে কাছে গেলেন, ডোপামিন ক্ষরণ হলো। পরেরবার কাছে গেলে একইভাবে ডোপামিন ক্ষরণ হবে না। আরেকটু ডোজ বাড়াতে হবে। হাত ধরা, তারপর আরেকটু, তারপর আরেকটু। বিবাহ-বহির্ভূত এই ডোপামিনপ্রসূত প্রেম আপনাকে একটু কাছে গেলেই ঠেলে বহুদূর নিয়ে যাবে। দেখবেন এক্ষেত্রে নিষেধও করা হয়েছে একদম ধারে কাছে যেতে।

প্রশ্ন আসে না মদের মতো ধীরে সুস্থে করলো না কেন? করলে কী হতো? দুইটাতে আলাদা কেন নির্দেশ? সব আদেশ আপনার আমার ভালোর জন্যই। ডোপামিনের বিষয়টা বোঝার পর এই আদেশের মর্ম বুঝতে পারবেন। আসলে সব আদেশই আমাদের ভালোর জন্য। বুঝি না আমরা। ভুল পথে যাই পরে সব লন্ডভন্ড হবার পর প্রশ্ন করি, "সাজানো গুছানো সবকিছু কখন এমন ভেঙ্গে চুরে গেল?"

চোখের জিনা পর্ন বা প্রেম নামক জিনা—সবগুলোর ক্ষেত্রে একই নিয়ম। একদম নিজেকে বাঁচিয়ে চলুন। একটু করে, সীমিত আকারে, অল্পস্বল্প এমন কোনো দোহাই নয়। সম্পূর্ণ এড়িয়ে চলুন। আর যারা ঢুকে পড়েছে, তারা?

খুব দ্রুত সরে আসুন। চোরাবালিতে আর ডুবে যাবেন না। একজন হেরোইনসেবীর উদাহরণ দিয়ে বোঝাই। হেরোইন প্রথমবার অতি অল্প সেবনে তার ব্রেইন ট্রিগার্ড হতো। এরপর আস্তে আস্তে ডোজ বাড়তে থাকে এবং এ থেকে সে বেরুতে পারে না। এরপর একসময় তাকে জেলে নিয়ে যাওয়া হয় কোনো এক কারণে। সেখানে হেরোইনের অভাবে প্রথমে তার কষ্ট হতো। একসময় ব্রেন মানিয়ে নেয় নতুন

কন্ডিশনের সাথে। আস্তে আস্তে একদম ডোজ লোয়ার হতে থাকে। এরপর একসময় ছাড়া পেয়ে সে ওভাবে আর টান অনুভব করে না। একবারে সরে আসলে কিছুদিন পর আমাদের ব্রেন মানিয়ে নেয়। তখন আর ডোপামিনের খোঁজে পাগলের মতো হাতড়ে বেড়াতে হয় না।

সরে আসুন এখান থেকে। খুব ভালো হয় বিয়ে করে ফেলুন পরিবারকে বুঝিয়ে। সাধারণত সারাজীবন একে অপরের পাশে থেকে সব যুদ্ধ করবে, সবাই এই শপথ নিয়ে প্রেমে পড়ে। বিয়ে করার এই যুদ্ধ দিয়েই শুরু করুন না! পাশাপাশি থাকার প্রথম যুদ্ধ যদি না-ই করতে পারেন, তবে সারাজীবন কীভাবে তা করবেন?

যদি তাও সম্ভব না হয়, রোজা রাখতে পারেন। রোজা রাখার ফলে নেগেটিভ এনার্জি অবদমিত হবে। যৌন আকাঙ্ক্ষার যে আগুন আপনাকে ঠেলে দিচ্ছে বিয়ে-বহির্ভূত সব অন্যায় পাপ কাজে, তা অবদমিত হবে। আবার এতদিনের পাপের ফলে ইরেক্টাইল ডিসফাংশানের যে ঝুঁকি, তা রিভার্স করতে পারবে। অর্থাৎ ইরেক্টাইল ডিসফাংশানের চিকিৎসায় ভূমিকা রাখতে পারে।

পজিটিভ কিছুতে আনন্দ খুঁজে নিন। নামাজ পড়ুন, কুরআন শুনুন, পরিবারকে সময় দিন। র‍্যান্ডোমাইজড কন্ট্রোল ট্রায়াল রিসার্চে প্রমাণিত কুরআন শোনার ফলে ডোপামিনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় মস্তিষ্কে। যা সাহায্য করে অবসন্নতা দূর করতে।

ট্রেন্ড ফলো করার যে বিশ্রী অভ্যাস আছে, তা বাদ দিতে চেষ্টা করুন। ট্রেন্ডি মুভিতে যে সেক্সুয়াল অবজেক্টিফিকেশন আছে, তা আস্তে আস্তে আবার টেনে নিয়ে যাবে সেই কালো চক্রে। মনে রাখবেন-জিনার ধারে কাছে না যাবার আদেশ আছে।

আলেক্সান্ডার দি গ্রেট ডোপামিনের তাড়নায় যুদ্ধের পর যুদ্ধ করে গেছেন। ভারতে তার সেনাবাহিনীর সাথে মনোমালিন্য শুরু হয়। তিনি যুদ্ধ করেই যাবেন। অথচ ২৮ বছরে চেনা পৃথিবী জয় করা শেষ তার। কিন্তু ডোপামিনের নেশা তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। ঠিক তেমনি নেপোলিওন। তাকে প্রথমবার যখন দ্বীপে নির্বাসন দেওয়া হলো, সে দ্বীপে সব ছিল। ভালো খাওয়া, আরামপ্রদ আসবাব, প্রসাধনী। তারপরও সে পালিয়ে গেল বিশ্বজয়ে। কেন? কারণ ডোপামিনের হাই ডিমান্ড, যেটা সে নিজেই সেট করেছে।

ডোপামিনের এই চক্র ভালো কাজে লাগান। এক আয়াত করে বুঝে কুরআন পড়ুন। আনন্দ খুঁজে পেলে হয়তো প্রতিদিনের তাড়নায় সময় খুঁজে নিবেন কুরআন পড়ার জন্য। একটা প্রশ্ন করুন নিজেকে: কুরআন পড়ে লোকে কাঁদছে কেন? কেন

খালিদ ইবনে ওয়ালিদের মতো দিগবিজয়ী বীর মৃত্যুর বিছানায় কুরআন ধরে চুমো খেয়ে আক্ষেপ প্রকাশ করেন ঠিকভাবে সময় দিতে না পারার? কেন মিশরের প্রেসিডেন্ট মুরসি কারাগারে আর কিছু না শুধু কুরআন ছুঁয়ে দেখতে চেয়েছেন? কুরআন পাঠে সুখ খুঁজে নিন। প্রতিদিন এক আয়াত দিয়েই শুরু করুন না! ফলাফল দেখুন কয়েক মাস পর।

আর যদি খারাপ কাজে ডোপামিন ক্ষরণ করেন, চোরাবালিতে ডুবতেই থাকবেন। যেটাকে আনন্দ ভাবছেন, সেটি আপনাকে ক্ষণিকের জন্য ওড়ার আনন্দ দিবে ঠিকই। কিন্তু তা পাহাড়ের খাদ থেকে ফেলে দেবার মাধ্যমে। সশব্দে পতনের আগেই বুঝতে চেষ্টা করুন। ওড়ার আনন্দ নিতে গিয়ে যেন পতন না হয়। ডোপামিনের অভাবে আপনি সাইকিয়াট্রিস্টদের লম্বা পেশেন্ট লিস্টে আরেকটা সংযোজন হবেন কি না, এই চয়েস একান্তই আপনার!

ইসলাম ও মননশীলতা

মননশীলতা (মাইন্ডফুলনেস) আমাদের এই সময়ের জন্য খুবই দরকারি একটি বিষয়। এটি মূলত সাইকোলজির একটি কনসেপ্ট। এর জন্য আজকাল অনেক মানুষ সাইকোলজিস্টদের কাছে যাচ্ছেন। এই বিষয়টা যদি কারো মধ্যে ঘাটতি থাকে অথবা একেবারেই যদি না থাকে, তাহলে এটা একটা সাইকোলজিকাল ডিসঅর্ডারের দিকে নিয়ে যেতে পারে এবং সেই সাইকোলজিকাল ডিসঅর্ডার এর নাম হচ্ছে ওসিডি (OCD)। অবসেসিভ-কম্পালসিভ ডিসঅর্ডার। আর এটা এখনকার সময়ে খুবই সাধারণ একটা বিষয় হয়ে গেছে। অবসেসিভ-কম্পালসিভ ডিসঅর্ডারের মানে হচ্ছে আপনি আপনার ভাবনাগুলোকে, চিন্তাগুলোকে একেবারেই নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন না। এত ওয়াসওয়াসা এবং অদ্ভুত ভাবনা আসে যে মানুষ যতই এটাকে বাধা দেয়ার চেষ্টা করে, ততই সে ভাবনাগুলো মনে উঁকি দিতে থাকে। কোনো কিছুতেই ফোকাস করতে পারে না তারা। আবার যখন ফোকাস করে, তখন সেই বিষয়টাতে একেবারে আবিষ্ট হয়ে যায়।

যেহেতু OCD একটি সাইকোলজিক্যাল ডিসঅর্ডার, তাই এটার চিকিৎসা সাইকোলজিস্টের কাছেই নিতে হবে। কিন্তু যে জিনিসটার অভাবে এই সাইকোলজিক্যাল ডিসঅর্ডার হয়, সেটাই আমাদের আলোচ্য।

মননশীলতা কী, এটা বলার আগে এটা ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন যে, আসলে এখনকার সময় এটা কেন আমাদের প্রয়োজন। এখনকার সময়ে distraction অনেক বেশি। মানুষের আজকালকার সমস্যাগুলোর কারণ কিন্তু টাইম ম্যানেজমেন্ট নয়, বরং ফোকাস ম্যানেজমেন্ট। আমরা যখন ইন্টারনেটে কোনোকিছুর ব্যাপারে পড়াশোনা করতে আসি বা কোনো ভিডিও দেখতে বসি, তখন ব্রাউজারে বিভিন্ন ট্যাব ওপেন হয়ে যায়। ফেইসবুক, ইউটিউব একসাথে খুলে যায় সেখানে। তারপর হয়তো সেখান থেকে কোনো ভিডিও অটোমেটিক্যালি চালু হয়ে যায় বা ওপেন

হয়ে যায় কোনো নিউজ আর্টিকেল। আমাদের মন চলে যায় সেদিকে, আসল জিনিস পড়ে থাকে তার জায়গায়। এমন প্রায়ই হয় যে আপনি সোশ্যাল মিডিয়ায় কোনো কাজ করার জন্য এসেছেন। কিন্তু সেই কাজটি বাদ দিয়ে অন্য কাজে ব্যস্ত হয়ে গেলেন। আপনি স্ক্রলিং করতেই থাকেন। তাই এখনকার সময়ে মনোযোগী থাকাটা এতটাই কঠিন হয়ে গেছে যে, কম বেশী আমাদের সবারই প্রধান সমস্যা হচ্ছে ফোকাস ম্যানেজমেন্ট। কীভাবে ফোকাস থাকা যায় এবং ফোকাসড থেকে কাজ করা যায়, এই জিনিসটাকে বলা হয় মননশীলতা। সাইকোলজিকাল ডিসঅর্ডার থাকলে তো সেটার জন্য সঠিক চিকিৎসা করাতে হবে। কিন্তু সাধারণভাবে আল্লাহ তাআলা মননশীলতার যে ধারণা আমাদের দিয়েছেন, সেটা আমাদের সকল সমস্যার সমাধান করতে পারে।

সাইকোলজিস্টদের মতে,

> *Mindfulness is the basic human ability to be fully present, aware of where we are and what we're doing, and not overly reactive or overwhelmed by what's going on around us.*

অর্থাৎ আশেপাশে যা হচ্ছে সেগুলোর ব্যাপারে এতটা প্রতিক্রিয়া না দেখানো এবং অতিরিক্ত চিন্তা (ওভারথিংকিং) না করা। কিন্তু মানুষ নিজেই নিজেকে সমস্যায় ফেলে দেয়। কীভাবে? অনেক বেশি ওভারথিংকিং করার মাধ্যমে। এই কারণেই তারা অস্থিরতা ও মানসিক চাপের শিকার হয়। একটা জিনিসে ফোকাস করলে তাদের মাথায় হাজারো ভাবনা আসে। এটার জন্য সঠিক থেরাপি আছে। পজিটিভ সাইকোলজি এগুলো নিয়ে অনেক কথা বলেছে। যদি আপনি মননশীল না থাকেন, ফোকাসড না থাকেন, আপনার নামাজও ঠিকমতো হবে না। আপনি হয়তো এক জায়গায় বসে থাকবেন, কিন্তু ভাবনা চলে যাবে অন্য কোথাও। আপনার স্বামী বা স্ত্রী আপনার সাথে কথা বলতে থাকবে, কিন্তু আপনি অন্য দিকে মনোযোগী থাকবেন। ফলে দেখা যায় ছোটখাট বিষয়ে লড়াই-ঝগড়ার দিকে রূপ নেয়। বন্ধুদের সাথে বা কোনো মিটিংয়ে বসে আছেন, কিন্তু আপনার মনোযোগ অন্যদিকে। মননশীল ফোকাস একেবারেই নেই। কীভাবে ফোকাসড থাকা যায়, এটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব। ইসলামি দিক তো বটেই, এটার সেক্যুলার কনসেপ্টও আছে।

সুফিজমে একে মোরাকাবা বলা হয়। মোরাকাবা হচ্ছে সুফিজমের একটা টেকনিক। এইখানে আমি সুফিজমের কথা বলছি, কারণ সুফিজম তাজকিয়ার উপরে অনেক জোর দেয়। সুফিজমে তাজকিয়ার এমন কিছু বিষয় আছে, যা কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত। আবার এমন কিছু বিষয়ও আছে, যেগুলো আমাদের যাচাই-বাছাই, পরীক্ষা করে তারপরে আমল করতে হবে। যদি আমরা কুরআন ও সুন্নাহ নিয়ে যাচাই করি আর সালাফদের বক্তব্য দেখি, তাহলে আমরা মোরাকাবা সম্পর্কে ধারণা পাই। আর এটার নামই হচ্ছে মননশীলতা। এখন ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মননশীলতার সংজ্ঞা হচ্ছে

> *Mindfulness in Islam is state of being aware of oneself in relation with Allah.*

সেক্যুলার কনসেপ্ট হচ্ছে আপনি নিজের ব্যাপারে সচেতন। অপরদিকে ইসলামি কনসেপ্ট হচ্ছে আপনি আল্লাহ তা'আলার ব্যাপারে সচেতন। তাঁর উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতন। আপনি আল্লাহর ব্যাপারে মননশীল। এটা আপনার খেয়ালে আছে যে আল্লাহ আছেন, আল্লাহর অস্তিত্ব আছে। আল্লাহ আমাকে দেখছেন এবং আল্লাহ আমার ভাবনাগুলো সম্পর্কে জানেন। আল্লাহ তা'আলা আমার প্রতিটা কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জানেন। এটাকে বলে মননশীল হওয়া। আর এটি হচ্ছে গাফিলতির ঠিক বিপরীত।

যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন অধিকাংশ মানুষই গাফেল। কীভাবে? মানে সে নিজের রবকে ভুলে গেছে। আর নিজের প্রতি অর্পিত দায়িত্ব কর্তব্যগুলোকে ভুলে গেছে। নিজের প্রতি যে জিম্মাদারী ছিল, সেগুলো ভুলে গেছে। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেন:

اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ

> "মানুষের হিসাব-কিতাবের সময় নিকটবর্তী; অথচ তারা বেখবর হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে।" (সূরাহ আম্বিয়া, ২১:১)

মানুষ যেন তার দায়িত্ব থেকে পালিয়ে বাঁচতে চাচ্ছে। মনে হয় আমরা সবাই escapism এর দিকেই যাচ্ছি। আমাদের চারপাশকে শুধু বিনোদন দিয়ে ভরপুর রাখছি। সময়গুলো কেটে যাচ্ছে। সারা দিনের বড় অংশ টিভি সিরিজ, নেটফ্লিক্স, ফেসবুক আর স্মার্টফোনের সাথে সময় কাটছে আমাদের। সময় চলে যাচ্ছে আর এদিকে ঠিকঠাক মতন নামাজ পড়া হচ্ছে না। দ্বীনের ইলম হাসিল করার সময় চলে

যাচ্ছে। যে জায়গায় ছিলাম, দিন শেষে ঠিক সে জায়গাতেই দাঁড়িয়ে আছি। আর এটাই হচ্ছে গাফিলতি। চারপাশে এমন জিনিসের সাথে জুড়ে থাকা, যেগুলো আমাদেরকে গাফেল করে, আল্লাহ তা'আলার স্মরণ থেকে দূরে রাখে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

"তোমরা তাদের মতো হয়ো না, যারা আল্লাহ তা'আলাকে ভুলে গেছে। ফলে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে আত্মবিস্মৃত করে দিয়েছেন। তারাই অবাধ্য।" (সূরাহ হাশর, ৫৯:১৯)

যে আল্লাহকে ভুলে যায়, আল্লাহ তাকে তার নিজেকেই ভুলিয়ে দেন। আর নিজেকে ভুলে গেলেই গুনাহের পথে পা বাড়ায় সে। তার অন্তর শক্ত হয়ে যায়। নিজেকে নিজে ভুলে যাওয়ার অর্থ কী? কেউ কি নিজেকে নিজে ভুলে যায়? ধরুন আপনার দাঁতে প্রচণ্ড ব্যথা। কিন্তু ডাক্তারের কাছে না গিয়ে ব্যথা নিয়েই বসে আছেন। এটাই নিজেকে নিজে ভুলে যাওয়া, আত্মবিস্মৃত হওয়া। নিজেকে নিজে ভুলে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে মানুষ ভুলে গেছে যে সে একটা রূহ। সে কোনো বস্তুগত জিনিস নয়। সে এটাও ভুলে যায় যে তার দায়িত্বশীলভাবে জীবনে চলা উচিত। ভুল পথে চললেও নিজের মধ্যে সেটার উপলব্ধি থাকে না। আর এগুলো সবই গাফিলতির কারণে হয়। আল্লাহকে ভুলে যাওয়া এবং আল্লাহর ব্যাপারে মননশীল না হওয়া, যদি তার ফোকাস আল্লাহ তা'আলার দিকে না থাকে তাহলে বাকি সব ব্যাপারে ফোকাস থেকে কীইবা লাভ হবে?

সূরাহ নিসার প্রথম আয়াতে আল্লাহ তা'আলা নিজের একটি বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন: আর-রক্বীব। আর-রক্বীব মানে সদা জাগ্রত, অতন্দ্র পর্যবেক্ষণকারী। তিনি আপনার প্রত্যেকটি কার্যকলাপ, গতিবিধি দেখছেন এবং আপনার ভেতরের হৃদস্পন্দনের ব্যাপারেও জানেন। আপনার অন্তরে যে ভাবনাগুলো আছে, সেগুলো সম্পর্কে তিনি জানেন। ভবিষ্যতে আপনি যা ভাববেন, সেগুলোও জানেন তিনি। এখান থেকেই মননশীলতার ধারণা আসে। যখন মানুষ খেয়াল করবে যে তার প্রতিটা চালচলন, অন্তরের ভাবনা, বলতে গেলে সবকিছুই আল্লাহ তা'আলা দেখছেন, তখন সে যেকোনো কাজই অত্যন্ত সতর্কতার সাথে করবে, যেন তার দ্বারা কোনো গুনাহ না হয়ে যায়। ঘরের বয়স্কদের হয়তো খেয়াল করবেন তাদের মুখ দিয়ে অনেক সময় অবচেতনভাবে আল্লাহ তাআলার প্রশংসা বের হয়। ভয়

পেলে, দুর্ঘটনা ঘটলে বা সুসংবাদ শুনলে তারা আলহামদুলিল্লাহ, ইন্নালিল্লাহ বলে ওঠে। কারণ তাদের সচেতন মনে আল্লাহ তাআলার স্মরণ ছিল।

আমাদের তরুণরা তো ইনশাআল্লাহ, মাশাআল্লাহ এগুলা নিয়ে হাসি-মজা করে। কিন্তু তারা তো জানেনা এই বিষয়গুলো আমাদেরকে কেন শেখানো হয়েছে। আমরা কেন প্রতিটা কথায় বারবার ইনশাআল্লাহ বলি। কিছু কিছু লোকের ইনশাআল্লাহ বলার অনেক অভ্যাস আছে। কারণ তারা আল্লাহর ব্যাপারে মননশীল। তারা প্রতিটি বিষয়ে আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করেন। তাই তাদের জন্য সুসংবাদ দিয়ে যখন মৃত্যুর সময় আসবে, তখনও অবচেতন মনে আল্লাহ তা'আলার নাম মুখ দিয়ে বের হবে। কিন্তু যে জীবদ্দশায় আল্লাহর নাম কখনো নেয়নি, মৃত্যুর সময় কালেমা বলা বা আল্লাহর নাম নেয়াটা তার কাছে অনেক কঠিন হয়ে যাবে। কারণ আপনার লাইফ স্টাইলই আপনার মৃত্যুর স্টাইল নির্ধারণ করবে। তাই নিজের একাকী সময়ে আল্লাহকে স্মরণ করুন। সেটা নিজের মুখ দিয়ে বলার চেষ্টা করুন এবং পরিবারের সদস্যদেরকেও এই কথাগুলো বলুন। কারণ মাশাআল্লাহ, সুবহানআল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ এগুলো সবগুলোতে আল্লাহর নাম আছে।

আল্লাহ তা'আলা কুরআনে বলেন:

وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

"আর একথা জেনে রেখো যে, তোমাদের মনে যে কথা রয়েছে, আল্লাহর তা জানা আছে। কাজেই তাঁকে ভয় করতে থাক। আর জেনে রেখো যে, আল্লাহ ক্ষমাকারী ও ধৈর্য্যশীল।" (সূরাহ বাকারা, ২:২৩৫)

আপনি হয়তো মানুষদেরকে ধোঁকা দিতে পারেন, কিন্তু তিনি আপনার মনের অভিপ্রায় জানেন। আপনি কাউকে কি উদ্দেশ্য করে বলছেন, আপনি কি কাউকে মজা করে বলছেন, নাকি রাগ দেখানোর জন্যে বলছেন, আপনার ভেতরের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ভালো করেই জানেন। আল্লাহর আরেকটি গুণবাচক নাম হচ্ছে আল-হালীম। এর অর্থ অত্যন্ত ধৈর্যশীল, মহা সহনশীল, প্রশ্রয়দাতা। আমাদের গুনাহগুলোকে আল্লাহ তা'আলা বরদাস্ত করেন। যদি আল্লাহ তা'আলা আমাদের গুনাহের জন্য পাকড়াও করা শুরু করেন, তাহলে তিনি কাউকেও ছাড় দিতেন না। সারাজীবন ধরে আমরা কি পরিমাণ জুলুম করে

থাকি। তাই সবসময়ে মননশীল থাকা মানুষের জন্য অনেক কঠিন। বিশেষ করে এখনকার এই সময়টাতে, যখন Distraction অনেক বেশি। মানুষ কুরআন তেলাওয়াত করার পর্যন্ত সময় পায় না। আমাদের সবার কথাই বলছি। কিন্তু কেন? যে সময়টা কুরআন তেলাওয়াত করার জন্য ছিল, সেটা ফেসবুক-ইউটিউব দখল করে রেখেছে। আর এমন সব ঘরোয়া সমস্যায় আমাদের সময় নষ্ট হচ্ছে, যেগুলোর কোনো দরকারই ছিল না। তো আমাদের মননশীলতা কোথায় থাকবে? মানুষ নিজের জন্য সময় বের করতে পারছে না। যে জিনিসটা আমাদের জন্য উপকারী, সেদিকে আমরা যাচ্ছি না। এর কারণ কী? কারণ এটাই যে, আমরা মননশীলতার অনুশীলন করছি না।

ইমাম ইবনু কাইয়িম রহিমাহুল্লাহ মননশীলতার ব্যাপারে বলেছেন:

> "মননশীলতা হচ্ছে বান্দার বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সকল অবস্থায় আল্লাহ তা'আলার ব্যাপারে অবিরত জ্ঞান ও নিশ্চিত বিশ্বাস।"

এটা অন্তরের ঠিক সেই অবস্থা, যখন আমরা আমাদের ভাবনা ও পদক্ষেপ দ্বারা আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্ব স্বীকার করে নিই। তখন আমরা খারাপ ভাবনাগুলো থেকে এই ভেবে বিরত থাকি যে, আল্লাহ তা'আলা আমাদের খারাপ জানবেন। কারণ কিয়ামতের দিন আমাদের সবাইকে আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে এখনকার সময়ে মানুষকে সন্তুষ্ট করার জন্য, মানুষদের সমালোচনার ভয়ে, আমরা কত কিছুই না করে থাকি। আল্লাহ তা'আলাকে আমরা মনের খেয়ালে একবারও স্মরণ করি না। দুর্ভাগ্যজনকভাবে বিশেষ করে আমাদের তরুণদেরকে আল্লাহ থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে, এখানে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে মিডিয়া। যেকোনো টিভি সিরিয়াল, নাটকে সাধারণত কী দেখায়? আল্লাহর প্রসঙ্গ কি থাকে কোনো নাটকে? মাঝে মাঝে শুধু এটুকুই দেখায় যে, যদি কখনো দোয়া করার প্রয়োজন হয় তখনই আল্লাহ তা'আলার প্রসঙ্গ আসে। তা না হলে কোনো ব্যাপারেই আল্লাহ থাকে না। যেন ধীরে ধীরে আল্লাহ তা'আলাকে আমাদের মন থেকে, আমাদের জীবন থেকে দূরে সরিয়ে রাখার ষড়যন্ত্র হচ্ছে। অবচেতন মনেই যেন আমরা আমাদের জীবন থেকে আল্লাহ তা'আলাকে দূরে সরিয়ে রাখছি। কোনোখানেই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কোনো নাম নেয়া হয় না। আর যখন ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে বিপথে চলে যায়, তখন আমরা আশা করি যে সে ঠিক হয়ে যাবে।

নামাজের সাথে মননশীলতার গভীর সম্পর্ক আছে। এ ব্যাপারে একটা ঘটনা বলছি। এক কোম্পানির ম্যানেজার খুব বদরাগী। তার অধীনস্থ কর্মচারীরা অনেক ভয় পেত তাকে। সে ম্যানেজারের পরিচিত কেউ একজন তাকে বলল এই বিষয়টাকে নিয়ন্ত্রণ করা দরকার। এটা তার ক্ষতি করছে। তাই ম্যানেজার একজন সাইকোলজিস্টের কাছে গেলেন।

সেই সাইকোলজিস্ট ম্যানেজারকে বললেন, "আপনি আমার সামনে দুই থেকে তিন মিনিট চুপচাপ থাকার চেষ্টা করুন। এই সময় নীরব থাকবেন এবং কিছুই ভাববেন না। আমার সামনে এই নীরবতার অনুশীলন করার চেষ্টা করুন।"

ম্যানেজার বারবার চেষ্টা করছিলেন কিন্তু পারছিলেন না। তার অন্তরে বিভিন্ন ভাবনা আসতে লাগল এবং রাগ বাড়তে থাকল। তারপরে ম্যানেজারকে আবার সেটা করতে বলা হলো। এখন আগের চেয়ে একটু ভালো পারফরম্যান্স দেখাতে পারলেন তিনি। তৃতীয়বারে আরো একটু ভালো করলেন।

সাইকোলজিস্ট বললেন, "এখন আপনি একাকী থাকা অবস্থায় নিজের ভাবনাগুলোকে নিয়ন্ত্রণ রাখবেন এবং ফোকাসড থাকবেন। আর মনের মধ্যেও নীরব থাকার চেষ্টা করবেন।"

তিনি প্র্যাকটিস করতে থাকলেন এবং এটা নিজের আয়ত্তে আনতে লাগলেন।

এগুলো অনুসরণ করে তার এতটা লাভ হলো যে, কেউ যদি ওনার সামনে রাগান্বিত হওয়ার মতো কোনো কথাও বলে, তখনও তিনি নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেন। কারণ এখন তার মধ্যে ধৈর্য চলে এসেছে আর নীরব থাকার অভ্যাস তো আগে থেকেই করে আসছিলেন। তারপর সেই সাইকোলজিস্ট বললেন, "এই যে জিনিসটা আমি আপনাকে শিখালাম, এটাই হচ্ছে নামাজ।" ঠিকভাবে নামাজ পড়লে তাতে আমরা কী করি? নীরব থেকে শুধু আল্লাহর স্মরণ প্রতিষ্ঠা করি। ফোকাসড থাকি। আমাদের মধ্যে ধৈর্য আসে। ভাবনাগুলো নিয়ন্ত্রণে রাখি। ওয়াসওয়াসাকে নিয়ন্ত্রণে রাখি এবং এদিক-ওদিকের কথা মাথায় আনি না। আর সিজদায় যাওয়ার সময় এমন একটা অনুভূতি নিজের মধ্যে নিয়ে আসি, যেন আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দেখছেন। আল্লাহ তা'আলার নিকটেই আছি আমরা।

এক ব্যক্তি রাসূল সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, "ইহসান কী?" তিনি বললেন, "আপনি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদাত করবেন, যেন আপনি

তাঁকে দেখছেন। আর যদি দেখতে না পান, তবে বিশ্বাস রাখবেন যে তিনি তো আপনাকে অবশ্যই দেখছেন।"

এটাই হচ্ছে ইহসান। যে ব্যক্তি ইহসান সহকারে নামাজ পড়বে, সেটা তার কতভাবে উপকারে আসবে! তার ফোকাস ঠিক থাকবে, তার মধ্যে ধৈর্য আসবে, সে নীরব থাকার অনুশীলন করবে। তার মধ্যে ধীর-স্থিরতা আসবে। আপনি নিজেই ভালো করে লক্ষ্য করে দেখুন নামাজ আমাদের কি শেখায়? তাকবিরে তাহরিমার পর আপনার নজর সিজদার জায়গার দিকে থাকে। অবশ্যই চোখ খোলা রেখে নামাজ পড়তে হয়। এটা আমাদের মননশীলতা এবং ফোকাস তৈরি করে। তারপরে আমরা রুকু এবং পরে সেজদায় যাই। এই একেকটা জিনিস, একেকটা মুভমেন্ট আমাদের কী শিখায়? ধৈর্য এবং ধীর-স্থিরতা। কিন্তু আফসোস! আমাদের নামাজে না ফোকাস থাকে, না ধৈর্য থাকে, না সেখানে আল্লাহ তা'আলার স্মরণ থাকে। সেখানেও আমাদের হৃদয় দুনিয়ার সাথেই লেগে থাকে। আমরা নামাজের মধ্যে কোনো কিছু প্ল্যানিং করতে থাকি। এখন আমাদের জন্য ফোকাস রেখে নামাজ পড়াটা বড় কঠিন হয়ে গেছে। তাই ফোকাসড থাকার চেষ্টা করুন। প্রথম প্রথম সেটা করা হয়তো কষ্টকর হতে পারে। তারপর আস্তে আস্তে অভ্যাস হয়ে যাবে। তো নামাজ হচ্ছে দিনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। যদি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজের এই অবস্থা হয়, তাহলে বাকি কাজগুলোর কী হবে? অনেকে তো নিয়মিত পড়েই না। যারাও বা নিয়মিত পড়ে, তাদেরও অনেক তাড়াহুড়া। এই নামাজ পড়ে ঠিক সেই ফায়দা হবে না, যে ফায়দাটুকু আমাদের পাওয়া উচিত ছিল। তাই নামাজের মাধ্যমে মননশীলতা আনার চেষ্টা করুন।

আর যারা আল্লাহ তা'আলার ব্যাপারে মননশীল, তারা নিজেকে নিজেই কাউন্সেলিং করতে পারে। যদি কোনো গুনাহ করার চিন্তা মাথায় আসে, তারা নিজের সাথে নিজেই কথা বলে। তারা ভাবে, "নাহ! আল্লাহ তো আমার উপর অসন্তুষ্ট হবেন।" তারা আল্লাহ তা'আলার সাথে কথা বলা শুরু করে দেয়। মনে মনে বলতে থাকে, "হে আল্লাহ, আমাকে সাহায্য করুন।" আর যারা মননশীল না, তারা আল্লাহর সাথে কথাই বলে না। তাঁকে স্মরণ করে না, আউযুবিল্লাহ পড়ে না এবং ভাবনাগুলোকে নিয়ন্ত্রণে রাখে না। এই জিনিসগুলো আস্তে আস্তে তাদের অভ্যাস হয়ে যায়। এবং ধীরে ধীরে ওভারথিংকিং এর অভ্যাস হয়ে যায় তাদের। ওয়াসওয়াসা তাদের একদম গ্রাস করে ফেলে।

একজন মননশীল মানুষ কখনো নেগেটিভ ভাবনায় নিজেকে জড়ায় না। এই ভাবনাগুলো কীভাবে আমাদের ভেতরে আসে এবং মনের মধ্যে বসে যায়, সে

ব্যাপারে বিস্তারিত বলছি। প্রথম ধাপ হচ্ছে, হুট করে মাথার মধ্যে যেকোনো বিষয়, ঘটনা বা মানুষের ব্যাপারে ভাবনা, ওয়াসওয়াসা বা গুনাহের চিন্তা চলে আসা। দ্বিতীয় ধাপ, সেই ভাবনাগুলোকে অ্যাটেনশন বা মনোযোগ দেওয়া। তৃতীয় ধাপ, সে ভাবনাগুলো নিয়ে মনে মনে নিজের সাথে অথবা মুখে অন্য কারোর সাথে কথা বলা। এতে সেই ভাবনাগুলো শক্তিশালী হয় ও প্রাণ পায়। তারপর চতুর্থ ধাপ হচ্ছে সেই ভাবনার সাথে সম্পর্কিত কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ। পঞ্চম এবং শেষ ধাপ হলো সে সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ। মানুষ নিজেকে বলে যে, সে এটা করবে তো করবেই। পর্নোগ্রাফি আসক্তি ঠিক এইভাবেই মানুষের উপর কাজ করে। এটাই হচ্ছে সেই সায়েন্স যে, কীভাবে ভাবনাগুলো প্রাণ খুঁজে পায় আর পরিপক্ক হয়।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "অনেক সময় এমন হয় যে আমার হৃদয় কুয়াশাচ্ছন্ন হয়। আমি আল্লাহর কাছে একশোবার ইস্তেগফার করি।"

এটাই হচ্ছে সেই উপায়, যেটা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মননশীল থাকার জন্য আমাদের বলেছেন। কিন্তু আমরা দিনে কতবারই বা ইস্তেগফার করি? ইস্তেগফার তো আমাদের চলতে-ফিরতে, উঠতে-বসতে করা উচিত। প্রত্যেক ফরজ নামাযের পরে আপনি যদি ফোকাসড থেকে ইস্তেগফার করেন, মুখ দিয়ে কী বলছেন সেটা খেয়াল করতে থাকেন, তাহলে দেখবেন মননশীলতার অভ্যাস গড়ে উঠবে।

এক সাহাবী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন, "আল্লাহর রাসূল! অনেক সময় আমার মনে এমন সব কথা আসে, যা মুখে উচ্চারণ করার চেয়ে আগুনে পুড়ে কয়লা হয়ে যাওয়াই বরং ভালো। আমি কী করতে পারি?" দেখুন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কী জবাব দিলেন! তিনি বললেন, "এটা তো খাঁটি ঈমানের আলামত।" (সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, বাবু বয়ানিল ওয়াসওয়াসা ফিল ঈমান)

সাহাবীদের মনেও এরকম আজব সব ভাবনা আসতো। মনের মধ্যে ভাবনা আসাটা খারাপ কিছু না। খারাপ তখনই হবে, যখন সেগুলো বাস্তবে রূপ দেয়া হবে। ভাবনাগুলো হচ্ছে রাস্তায় আপনার আশেপাশে হেঁটে যাওয়া মানুষগুলোর মতো। যতক্ষণ না আপনি তাদের বিরক্ত করছেন, তারাও আপনাকে বিরক্ত করবে না। কিন্তু জীবনের সমস্যাগুলো নিয়ে আমরা এত অতিরিক্ত চিন্তা করি যে, আমাদের ভালো থাকাটাই সংকটে পড়ে এবং মানসিক অবস্থার অনেক ক্ষতিসাধন হয়। আর সেটা সবশেষে আল্লাহ তা'আলার ইবাদাতে প্রভাব ফেলে। শয়তানের আলটিমেট

উদ্দেশ্যই হচ্ছে যেন সে আমাদেরকে আল্লাহ তা'আলার ইবাদত থেকে বিমুখ করে দিতে পারে। যদি সে ইবাদাত থেকে বিরত রাখতে না পারে, যে ইবাদাত করছি সেখানে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে। তাই সে ভাবনাগুলোকে ইগনোর করার চেষ্টা করুন। সেগুলো আপনার উপর কোনো প্রভাব ফেলবে না। রিল্যাক্স থাকুন। আপনি তাদের সাথে যুদ্ধ করার চেষ্টা করলে সেগুলো আরো বাড়তেই থাকবে।

অন্তরে যে অযাচিত ভাবনাগুলো আসে, তার একটি বড় কারণ অতীত ও ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তা করা। তাই সেগুলো দূর করার উপায় হচ্ছে অতীত ও ভবিষ্যতের ব্যাপারে একেবারে চিন্তা না করা। শুধুমাত্র বর্তমানকে নিয়েই ভাবুন। বর্তমান মানে "এখন আমি কী করব? যদি আগামীকাল আমার মৃত্যু হয়ে যায়, তখন আল্লাহকে কী জবাব দিব? আল্লাহর সামনে কী নিয়ে দাঁড়াবো?" এটাই হচ্ছে বর্তমান নিয়ে ভাবনা। এটার ব্যাপারে ভাবুন। ভবিষ্যৎ নিয়ে আমরা এমন এমন সব পরিকল্পনা করি, যেগুলো এখনো হয়নি। আর অতীত নিয়ে অতিরিক্ত দুশ্চিন্তা করবেন না। যদি ঐরকম না হতো, যদি এরকম হতো, যদি ঐ রকম করতাম, তাহলে এই ভাবে হতো—এসব ভাবনা আমাদের মনে ঘুরপাক খায়। যদি অন্তরকে নীরব রাখতে চান, তাহলে অতীতের দুশ্চিন্তা থেকে দূরে থাকুন। আর ভবিষ্যত নিয়ে না ভাবার মানে এইটা না যে আপনি প্ল্যানিং করবেন না। কিন্তু ভবিষ্যতে কী হবে, সেটা নিয়ে ভয় করা ছেড়ে দেন। ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবতে ভাবতে নিজের উপর টর্চার করবেন না।

সমস্যা সমাধান করার মালিক তো আল্লাহ। আল্লাহ তা'আলার ব্যাপারে মননশীল হয়ে যান এবং এটার পুরস্কার অনেক বড়। আল্লাহ তা'আলা কুরআনে বলেন:

"যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্য (সমস্যা থেকে উত্তরণের) রাস্তা বের করে দেন, আর তাকে এমন উৎস থেকে রিজিক প্রদান করেন, যা সে কল্পনাও করতে পারে না। যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর ভরসা করে, আল্লাহই তার জন্য যথেষ্ট।" (সূরাহ তালাক, ৬৫:২-৩)

প্রত্যেক মানুষের দ্বারাই কোনো না কোনো গুনাহ হয়ে যায়। তাই ইস্তেগফার করুন। নামাজকে আরো সুন্দর করে পড়ার চেষ্টা করুন। অতীত এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তা করবেন না। আল্লাহ তা'আলার সাথে কথা বলুন। আল্লাহকে মনের মধ্যে আনার চেষ্টা করুন। গুনাহের যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন, আল্লাহ তা'আলা থেকে দূরে সরে যাবেন না। শয়তানের এই ওয়াসওয়াসার মধ্যে পড়ে যাবেন না যে, আল্লাহ আপনাকে পছন্দ করেন না। আল্লাহ তা'আলা আপনার অন্তর

দেখবেন। তাই নিজেকে ডিমোটিভেট করবেন না। ইনশাআল্লাহ, মাশাআল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ এই শব্দগুলো আপনার মুখ থেকে নিয়মিত বের হওয়া প্রয়োজন। যাতে মৃত্যুর সময় বলিউডের কোনো গান মুখ থেকে বের হওয়ার পরিবর্তে এই কথাগুলো আপনি সহজে বলতে পারেন। মননশীল থাকার যে উপায়গুলো জানলাম, আল্লাহ তা'আলা সেগুলোর উপর আমাদেরকে আমল করার তৌফিক দান করুন। আল্লাহ তা'আলা যেন আমাদের তাঁর ব্যাপারে মননশীল বানিয়ে দেন।

তাজকিয়ায়ে নফস

আপনারা কি আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু এর নাম শুনেছেন? তাকে উম্মতের আমানতদার বলা হয়। তাঁর সম্পর্কে লেখতে গেলে তাহলে আলাদা বই লেখা যাবে। সংক্ষেপে বলতে গেলে, তিনি নবুয়তের শুরুর দিকে ইসলাম গ্রহণ করেন। আশারায়ে মুবাশশারা অর্থাৎ জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশ সাহাবীদের একজন ছিলেন তিনি। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এর সময়কালে তিনি সিরিয়ার দামাস্কাসের গভর্নর নিযুক্ত হন। ঐ সময়ে দামাস্কাস পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ শহরগুলোর মধ্যে একটি ছিল। রোমানদের কাছ থেকে এই শহর জয় করা হয়। গভর্নর নিযুক্ত হওয়ার পরেও আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু অনেক সরল সাদাসিধে জীবনযাপন করতেন।

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এর একটা অভ্যাস ছিল তাঁর গভর্নরদের বাসা ঘুরে দেখা। তারা কীভাবে জীবনযাপন করছে, তা দেখতেন তিনি। একবার খলীফা উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু সিরিয়া সফরে গেলেন। সেখানে আবু উবাইদা রাদিয়াল্লাহু আনহু কে অত্যন্ত সাদামাটা পোশাকে দেখতে পেয়ে বললেন, "চলুন, আপনার বাসা থেকে ঘুরে আসি।"

আবু উবাইদা রাদিয়াল্লাহু আনহু একটু ইতস্ততবোধ করলেন। বললেন, "আমীরুল মুমিনীন, বরং আপনার ব্যবস্থা অন্য কোথাও করি।"

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু অনেক জোরাজুরি করে আবু উবাইদার ঘরে আসলেন। এটা সেই কক্ষ, যেখানে রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াস থাকতেন। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর বাসস্থানে গিয়ে সেখানে আরো বেশি সরল-সাদাসিধে জীবনধারার চিহ্ন দেখতে পান। একটি তলোয়ার, একটি ঢাল ও উটের একটি হাওদা ছাড়া তাঁর বাড়িতে আর কিছু নেই।

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, "আবু উবাইদা, আপনি দামাস্কাসের গভর্নর হয়ে এভাবেই জীবন যাপন করছেন? আপনি তো আপনার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের ব্যবস্থা করে নিতে পারতেন।"

খলীফার জবাবে আবু উবাইদা বললেন, "আমীরুল মুমিনীন, আমাদের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট।"

একবার উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু উপঢৌকন হিসেবে চারশ দীনার ও চার হাজার দিরহাম আবু উবাইদা রাদিয়াল্লাহু আনহু এর কাছে পাঠালেন। তিনি সব অর্থই সৈনিকদের মধ্যে বণ্টন করে দেন। একটি পয়সাও রাখলেন না নিজের জন্য।

উমর একথা শুনে মন্তব্য করেন, "আলহামদুলিল্লাহ! ইসলামে এমন লোকও আছে।"

আরেকদিন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এক মজলিসে বসে ছিলেন। তাঁর সাথে ছিলেন কিছু সাহাবীও। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু সবাইকে একটা প্রশ্ন করলেন, "যদি আপনাদের সবার একটি ইচ্ছা পূরণ হয়ে যায়, তাহলে আপনারা কী ইচ্ছা পোষণ করবেন?"

এক সাহাবী বললেন, "যদি আমার কাছে পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ থাকত, তাহলে আমি সব দান সাদাকা করতাম।"

আরেক সাহাবী বললেন, "আমার কাছে যদি অনেক জমি থাকতো, তাহলে সবই আল্লাহর রাস্তায় ওয়াকফ করে দিতাম।"

এভাবে সাহাবীরা তাদের নিজ নিজ ইচ্ছার কথা বললেন। শেষে এক সাহাবী বললেন, "আমি এই ইচ্ছা করতাম যে, আমি এক কক্ষ ভর্তি মানুষ পেতাম যেখানে সবাই আবু উবাইদাহ ইবনুল জাররাহর মতো হতো।"

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এটা শুনে বললেন, "তুমি আসলেই সঠিক বলেছো।"

তো এখানে আসল কথা হচ্ছে ম্যানপাওয়ার। যখন মানুষ কোয়ালিটিফুল হবে, আবু উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু এর মতো হবে, মুসলিম উম্মাহ অবশ্যই উন্নতির শিখরে আসবে। আমাদের অবনতির কারণ হচ্ছে আমাদের অন্তরে ওয়াহ্‌হান চলে এসেছে। সাহাবীরা রাসূলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আল ওয়াহ্‌হান কী?' তিনি

বললেন, "হুব্বুদ্দুনয়া ওয়া কারাহিয়াতুল মাউত" অর্থাৎ 'দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা এবং মৃত্যুকে অপছন্দ করা।'

মুসলিমদের দুনিয়ার সাথে কোনো লেনাদেনা নেই। মুসলিমরা দুনিয়াতে এসেছিল ইনসাফ কায়েম করার জন্য। এ পৃথিবীকে নেতৃত্ব দেয়ার জন্য। এই পৃথিবীর শেষ আশা ছিল মুসলিমরাই। কিন্তু সেই মুসলিমরাই আজ নিরাশ হয়ে পড়েছে। সে নিজেই বিভিন্ন গুনাহে জড়িয়ে গেছে। সে নিজেই জানে না তার জীবনের ফালসাফা (জীবনদর্শন) কী। যেদিন এই উম্মাহর তরুণরা জানতে পারবে তাদের জীবনের ফালসাফা কী এবং তাদের সামনে কী আছে, দেখবেন তারা কীভাবে সারা দুনিয়ায় আশার আলো জ্বালিয়ে দেয়।

আমাদের আবু উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু এর মতো মানুষ দরকার। এমন মানুষ, যাদের নফস অনেক শক্তিশালী ছিল। এমন মানুষ, যাদের সামনে পাহাড়ও নরম হয়ে গেছে। তাঁর আত্ম-নিয়ন্ত্রণও (সেলফ কন্ট্রোল) অনেক বেশি ছিলো। আমাদেরকে নিজেদের চরিত্র নিয়ে কাজ করতে হবে। ইচ্ছাশক্তি নিয়ে কাজ করতে হবে। self-esteem নিয়ে কাজ করতে হবে। দুনিয়াবী টেনশন থেকে নিজেকে হালকা করতে হবে, যাতে আমাদের ফোকাস সব সময় আখেরাতমুখী হয়। তাই আমাদের তাজকিয়ায়ে নফস নিয়ে কাজ করতে হবে, যাতে আমরা আবু উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু এর মতো মানুষ হতে পারি।

তাজকিয়ায়ে নফসের অর্থ কি আপনারা জানেন? আল্লাহ তাআলা কুরআনে এ বিষয়ে অনেক আয়াত উল্লেখ করেছেন। তাজকিয়া মানে হচ্ছে কোনো কিছু পাক করা বা পবিত্র করা, পরিষ্কার করা। তাজকিয়ায়ে নফস মানে নিজের নফসকে পরিষ্কার করা। তাজকিয়ায়ে নফস ঠিকমতো না হলে জীবনে চলাটা কত কঠিন হয়ে যায়, এ ব্যাপারে আমি এক পরীক্ষার কথা উল্লেখ করছি।

১৯৭২ সালে Marshmallow experiment নামে একটি স্টাডি করা হয়। এই নামে আপনারা গুগলে সার্চ করে দেখতে পারেন। Marshmallow বলতে এক ধরনের টফি বা মিষ্টিজাতীয় খাবার বুঝায়। আমেরিকার স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটির সাইকোলজিস্ট Walter Mischel যাদের নিয়ে এই স্টাডি করেছিলেন, তারা সবাই ছিল শিশু। তাদের প্রত্যেকের সামনে একটি Marshmallow রেখে বলে দেয়া হল, চাইলে যে কেউ এই Marshmallow খেতে পারে। কিন্তু যে না খেয়ে পনের মিনিট নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবে, তাকে দুইটি Marshmallow দেওয়া হবে।

প্রায় অর্ধেকের বেশি বাচ্চা Marshmallow খেয়ে ফেলল। তারা নিজেদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি। কিছু বাচ্চা খায়নি। তাদেরকে যে আদেশ দেয়া হয়েছিল, তারা তা পালন করেছে এবং নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে দেখিয়েছে। গবেষক সেসব বাচ্চাদের জীবন পরবর্তী দশ-পনের বছর ধরে পর্যবেক্ষণ করেন। তাদের সবার বায়োডাটা নেন। তিনি দেখতে পেলেন যারা Marshmallow তাড়াতাড়ি খেয়ে ফেলেছে, তারা জীবনে এতটা উন্নতি করতে পারেনি। কারণ তাদের আত্ম-নিয়ন্ত্রণ শুরু থেকেই ছিল কম। আর যারা Marshmallow খায়নি, তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণও ছিল বেশি, জীবনে উন্নতি করতে পেরেছে তারা।

এই স্টাডি থেকে প্রমাণিত হয়, সফলতার জন্য নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ থাকাটা অনেক জরুরি। আর এটাকেই আমরা বলি তাজকিয়ায়ে নফস। মোটকথা, আপনি কি নিজের আকাঙ্ক্ষা, চাওয়া-পাওয়াগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন কি না। যেমন ধরুন, আপনার প্রিয় খাবারটি বিশাল পরিমাণে আপনার সামনে রাখা। তখন আপনি কি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে ওই হাদীসের উপর আমল করতে পারেন, যেখানে পেটের এক-তৃতীয়াংশ খালি রেখে পানাহার করতে বলা হয়েছে?

আমাদের আত্ম-নিয়ন্ত্রণ কি আমাদেরকে ভরপেট খাওয়া থেকে বিরত রাখতে পারে? হারাম মুভি, ওয়েব সিরিজ থেকে দূরে রাখতে পারে? নাকি আমাদের আত্ম-নিয়ন্ত্রণ এতটাই দুর্বল যে একটা গেমই আমাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করে? মানুষজন আট থেকে দশ ঘন্টা ধরে টানা পাবজি, ফ্রি ফায়ার গেম খেলে। তার মানে ওই গেমই তাদের নিয়ন্ত্রণ করছে। তাই আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে এটাই বলেছেন

قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا

وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا

> "অবশ্যই সফলকাম হয়েছে সে ব্যক্তি, যে নিজেকে (নফস বা আত্মা) পরিশুদ্ধ করেছে; আর বিফলকাম হয়েছে সেই ব্যক্তি যে নিজেকে পাপাচারে কলুষিত করেছে।" (সূরাহ শামস, ৯১:৯, ১০)

তাছাড়া আত্ম-নিয়ন্ত্রণ অন্যতম একটি নেতৃত্বগুণ। তাই এখনকার সময়ের বিভিন্ন সাইকোলজিস্ট, গবেষকরা আমাদের জানাচ্ছেন কীভাবে মানুষ তার নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ বাড়াতে পারে। যেসব সেলেব্রিটি খেলোয়াড়, মডেল, অভিনেতাদের আমরা সীমাহীন বিলাসী জীবনযাপন করতে দেখি, তারাও কিন্তু আত্মনিয়ন্ত্রণের বাইরে না।

যে শরীর দিয়ে তারা এত কোটি টাকা উপার্জন করে, সেই শরীরকে ঠিকঠাক মাপমতো রাখতে তাদের অকল্পনীয় রকম কষ্টকর আত্মনিয়ন্ত্রণের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। চাইলেই তারা খাদ্যাভ্যাস ও ব্যায়ামের রুটিনে ব্যত্যয় ঘটাতে পারে না। অভিনেতা হেনরি ক্যাভিল এক মুভির মাঝখানেই আরেক মুভির শুটিং-এর ডাক পেয়েছিলেন। প্রথম মুভির প্রয়োজনে রাখা গোঁফটা দ্বিতীয় মুভির জন্য শেইভ করতে হবে। প্রথমটির পরিচালক তাকে শেইভ করার অনুমতি পর্যন্ত দেননি। মানে এমনকি গোঁফ রাখার ব্যাপারেও তাদের নিজেদের মনমতো চলার কোনো উপায় নেই।

আল্লাহ পুরুষদেরকে ঘরের নেতা বানিয়েছেন। তাই তার অনেক আত্ম-নিয়ন্ত্রণ থাকা দরকার, যাতে সে সবাইকে ম্যানেজ করতে পারে, যেকোনো পরিস্থিতিতে মাথা ঠান্ডা রাখতে পারে, প্রয়োজনের সময় ত্যাগ স্বীকার করতে পারে। আল্লাহ আপনাদের কাউকে বড় ভাই বানিয়েছেন। আপনার যদি সহজেই রাগ চলে আসে এবং বাবা-মার সাথে উঁচু গলায় কথা বলেন, তাদের সাথে জিদ দেখান, তাহলে আপনার ছোট ভাই বোনেরা আপনার থেকে কী শিখবে? আপনাকে তো আল্লাহ লিডার বানিয়েছেন। কিন্তু আপনার মধ্যে যদি আত্ম-নিয়ন্ত্রণ না থাকে, তাহলে তো সেটাই হবে, যেটা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: যে নফস নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হয়েছে, সে ধ্বংস হয়েছে।

এছাড়া আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ

وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ

> "নিশ্চয় সাফল্য লাভ করবে সে, যে শুদ্ধ হয় এবং তার পালনকর্তার নাম স্মরণ করে, অতঃপর নামায আদায় করে।" (সূরাহ আ'লা, ৮৭: ১৪, ১৫)

নামাজ পড়ার জন্য অনেক আত্ম-নিয়ন্ত্রণ দরকার। যেইমাত্র অন্তরে কোনো খারাপ খেয়াল আসে, তখনই উঠে নামাজে দাঁড়ানো উচিত। এটা সবার জন্য সহজ নয় বটে। কিন্তু বিশ্বাস করুন, এরকম করতে পারলে আপনি আপনা-আপনি উপরে চলে আসবেন। এটাই আল্লাহ তা'আলার কুদরত। যখনই আমরা তাজকিয়ায়ে নফস করব, তখনই আমরা শীর্ষে চলে আসবো। অটোমেটিক্যালি সম্মান পাব সব জায়গা থেকেই।

দুনিয়ায় থাকতে গিয়ে বা এর মোহে পড়ে আমরা ভুলে গিয়েছি যে, মৃত্যুর পরে আমাদেরকে আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে। আমাদের প্রতিটা কাজের জবাব দিতে হবে। আমরা এটাও ভুলে গেছি যে আমাদের রূহ নামে তো একটা জিনিসও দেওয়া হয়েছে আমাদের সাথে। আমরা শুধু আমাদের শরীরকে ডায়েট দিচ্ছি, শরীরের প্রতি আমরা কতই না যত্ন নিচ্ছি। জিমে যাচ্ছি, ডাক্তার, পুষ্টিবিদদের নানা পরামর্শ ফলো করছি। কিন্তু রূহের কথা আমারা কয়জনই বা খেয়াল করছি? রূহ এ মুহূর্তে চিৎকার করে জানান দিচ্ছে, সে দিনের পর দিন আরো দুর্বল হচ্ছে। এখানে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হচ্ছে Have I lost myself? আমি কি নিজেকে নিজে হারিয়ে ফেলেছি। এ দুনিয়ার এই দৌড়ে আমরা কি কোথাও দশ বা পনেরো মিনিট বসে এটা ভাবি যে, আমার দিনগুলো কীভাবে পার করছি? বা আমার জীবনটা কেমন চলছে? মানে আমার পড়াশোনা কেমন হচ্ছে, আমার পরীক্ষার ফলাফলগুলো কেমন হচ্ছে? বাবা-মা'র সাথে আমার সম্পর্কগুলো কেমন যাচ্ছে? বা কখনো কি দশ মিনিট বসে চিন্তা করেছি যে, আমি ফালতু কাজে সময় নষ্ট করছি কি না? এই অবসর সময়টা কি আমি ভালো কোনো বই পড়তে পারি বা কোনো স্কিল শিখতে কাজে লাগাতে পারি?

এই চিন্তা-ভাবনাই আমাদেরকে তাজকিয়ার দিকে নিয়ে যাবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে আজকালকার সময়ে প্রায় কারো কাছেই এই সময়টা নেই, যাতে সে নিজেকে নিয়ে একটু চিন্তা-ভাবনা করে।

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা বলেন:

> "হে আদম সন্তান, আমার ইবাদাতের জন্য নিজের অবসর সময় তৈরী কর ও ইবাদাতে মন দাও। তাহলে আমি তোমার অন্তরকে প্রাচুর্য দিয়ে ভরে দেব এবং তোমার দারিদ্র্য ঘুচিয়ে দেব। আর যদি তা না কর, তবে তোমার হাতকে ব্যস্ততায় ভরে দেব এবং তোমার অভাব কখনোই দূর করব না।"[১২]

যে ব্যক্তি আখিরাতকে ভুলে দুনিয়ার পিছনে পড়ে থাকে, দুনিয়া তার জন্য কষ্টকর হয়ে যায় এবং তার জীবনে ব্যস্ততা আসতেই থাকে। তার কোনো টাইম ম্যানেজমেন্ট হয় না এবং দুনিয়াবী জিনিসগুলো তার হাত থেকে ফসকে বের হয়ে যায়। কখনো কাউকে খুশি করতে হয়। কখনো কোনো কমিটমেন্ট চলে আসে। না

---

[১২] তিরমিজী: ২৬৫৪; ইবনে মাজাহ: ৪১০৭

নামাজ পড়ার সময় থাকে, না তাজকিয়া করার সময় থাকে, না জিকির-আযকার, তিলাওয়াত করার সময় থাকে।

তাজকিয়ায়ে নফসের উদ্দেশ্যে কেবল অনেকে অনেক লেকচার শোনা, বিভিন্ন বই-কিতাব পড়া পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নয়। যতক্ষণ না অন্তরের ভেতর থেকে আওয়াজ আসবে, ততক্ষণ পর্যন্ত পরিবর্তন হওয়া সম্ভব না। যতক্ষণ না পর্যন্ত হৃদয় ডাক দেবে, "Where are you going?"

ভেতর থেকে আওয়াজ তখনই আসবে, যখন আপনি কিছু সময় নিজের সাথে অতিবাহিত করবেন। প্রতিদিন দশ মিনিট থেকে পনের মিনিট করে নিজের সাথে নিজে বসুন। সারাদিন কী কী করলেন, একটা ডায়েরীতে তা নোট করুন। এভাবে প্রতিদিন নিজের প্রগ্রেস দেখুন। আপনার ব্যক্তিত্ব কি উন্নত হচ্ছে? আপনার পড়াশোনা কি ভালো হচ্ছে? আপনার ইবাদাতগুলো কি ভালো হচ্ছে? অল্প কিছু সময়, এই দশ থেকে পনের মিনিট। ব্যস, এতটুকুই যথেষ্ট। এটা কোনো কঠিন কাজ না। আমাদের ভেতর থেকে সেই মানুষটাকে জাগাতে হবে, যে সুপার ডুপার মোটিভেটেড হয়ে এ পৃথিবীতে এসেছিল, যে আল্লাহকে বলেছিল "আমাদেরকে পৃথিবীতে পাঠান। আমরা পৃথিবীতে যাব এবং আপনার শরীয়ত কায়েম করব।"

Self motivation is the best motivation. যখন ভেতর থেকে আওয়াজ আসবে তখনই পরিবর্তন আসবে। যখন ভেতর থেকে আওয়াজ আসবে না, তখন কিছুই হবে না। সেই মানুষটাকে জাগিয়ে তুলুন। তো সেটা জাগিয়ে তোলার জন্য নফসের ব্যাপারে আমাদের জানতে হবে। আল্লাহ তা'আলা কুরআনে তিনটি নফসের কথা বলেছেন।

১) নফসে লাওয়ামা।

২) নফসে মুতমাইন্নাহ।

৩) নফসে আম্মারা।

নফসে লাওয়ামা

'লাওম' মূল থেকে 'লাওয়ামা' শব্দ গঠিত। এর অর্থ তিরস্কার ও ধিক্কার দেয়া। 'নফসে লাওয়ামা' বলে এমন নফস বোঝানো হয়েছে, যে নিজের কাজকর্মের হিসাব নিয়ে নিজেকে ধিক্কার দেয়। মানুষের এ নফসের বৈশিষ্ট্য হলো মন্দ পরিহার করা এবং হঠাৎ গুনাহের কাজ করে ফেললে আফসোসের অন্ত না থাকা। এই নফস মন্দ কাজ সংঘটিত হওয়ার পর অনুতপ্ত হয় এবং তা থেকে নিজেকে বিরত রাখে।

হাসান বাসরি রহিমাহুল্লাহ বলেন,

> 'আল্লাহর কসম! তুমি মুমিনকে সর্বাবস্থায় নিজের মনকে তিরস্কার করতে দেখতে পাবে। তার সব কাজেই সে কিছু না কিছু ত্রুটি খুঁজে পায়। তাই কেন এ ত্রুটি হলো তা ভেবে সে লজ্জিত ও অনুশোচিত হয় এবং মনকে সে জন্য তিরস্কার করে। পক্ষান্তরে পাপাচারী দুষ্কৃতিকারী অসংকোচে অন্যায়-অপকর্ম করে, তা নিয়ে মনকে সে কদাচিৎই ভৎর্সনা করে।'

নফসে লাওয়ামার ব্যাপারে কুরআনে বলা হয়েছে,

وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ

> "আরও শপথ করি সেই মনের, যে নিজেকে ধিক্কার দেয়।" (সূরাহ কিয়ামাহ, ৭৫:২)

ধরুন আপনি কারো সাথে অন্যায় হতে দেখছেন। তখন আপনার ভেতর থেকে একটা আওয়াজ আসে যে এটা ভুল হচ্ছে, এটা হওয়া উচিত না। আপনাকে তার সাহায্য করা উচিত। এটাই আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য উপহার। যখন মানুষ তার ভুল বুঝতে পারে এবং তওবা করে বা যখন কেউ ইসলাম জানতে ও মানতে শুরু করে, তখন নফসুল লাওয়ামা প্রভাব বিস্তার করে এবং সে অন্যায় করতে বিব্রত বোধ করে। এটা হলো মানুষের শুদ্ধতার প্রাথমিক অবস্থা। তাই এই নফসের উপর আমাদের কাজ করা উচিত। যদি এই নফস মরে যায়, তাহলে আমাদের অবস্থা ঐ রকমই হবে যেমনটা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

''যদি লজ্জা না থাকে, তাহলে যা ইচ্ছে তা-ই কর।''[১৩]

মানে যার কোনো লজ্জা শরম নেই, তার কাছ থেকে আর কী আশা করা যায়? সে মন চায় যা খুশি করতে পারবে।

এখন এই নফসকে কীভাবে শক্তিশালী করা যায়? এই নফসের কীভাবে তাজকিয়া করা যায়? এর জন্য প্রতিদিন কুরআন পড়া হচ্ছে সবচেয়ে উত্তম উপায়। কারণ আপনি রোজ ঐসব আয়াত তেলাওয়াত করবেন যেখানে বলা থাকবে, আল্লাহর কাছে আমাদের যেতে হবে এবং আল্লাহ আমাদের হিসাব নিবেন। তাই সেগুলো পড়ে আমাদের নফস অবশ্যই Boost হবে। তাই কুরআনের অর্থ সম্পর্কে ভালোভাবে জানুন, এমন সব লেকচার শুনুন যেখানে আপনার নাফসুল লাওয়ামা শক্তিশালী হবে। যদি আগামীকালকে এমন এক পরিস্থিতির শিকার হন যে আপনার নামাজ পড়তে বা ভালো কাজ করতে মন চাচ্ছে না, তখন নিশ্চয়ই আপনার ঐসব কথা মনে আসবে। তখন বিভিন্ন লেকচার ও কুরআনের আয়াতগুলো আপনার অবচেতন মন থেকেই আসবে।

নফসে মুতমাইন্নাহ

নফসে মুতমাইন্না এর অর্থ প্রশান্ত আত্মা বা স্থির চিত্ত। মহান আল্লাহর প্রতি অবিচল বিশ্বাস পোষণকারী সত্যের অনুগামী স্থির চিত্তের নামই নফসে মুতমাইন্নাহ যা সুখ-দুখ আনন্দ-বেদনা, বিপদ-মুসিবত ও জীবনের বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতে আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থা পোষণ করে এবং এর উপর অবিচল থাকে। সামান্য সমস্যা ও দুর্বিপাকে অস্থির হয় না, হা-হুতাশ করে না, আশাহত হয় না এবং আল্লাহর প্রতি কুধারণা পোষণ করে না। বরং সকল অবস্থায় আল্লাহর প্রশংসা করে এবং তাঁর সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট থাকে। এ ধরনের বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী যে হৃদয়ে মধ্যে বিদ্যমান থাকে, সেটাই ইসলামের পরিভাষায় নফসে মুতমাইন্নাহ।

এই মনের অধিকারীর জান কবজকালে আল্লাহর পক্ষ থেকে ডেকে বলা হয়

---

[১৩] বুখারী: ৩৪৮৪

يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ

ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً

فَادْخُلِي فِي عِبَادِي

وَادْخُلِي جَنَّتِي

"হে প্রশান্ত মন, তুমি তোমার পালনকর্তার নিকট ফিরে যাও সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে। অতঃপর আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর। (সূরাহ ফজর, ৮৯:২৭-৩০)

এই নফস হচ্ছে প্রশান্ত ও পরিপূর্ণ অনুভব করার নফস। এই নফস সব সময় নেককাজ ও কল্যাণের দিকে মানুষকে ধাবিত করে। যেহেতু বান্দা আল্লাহর আনুগত্য করে, তাঁর জিকির ও স্মরণে মগ্ন থাকে এবং তাঁরই আদেশ-নিষেধ মেনে চলে, সেহেতু সে তাঁর কাছেই আরাম পায়, তাঁকে ছেড়ে অন্য কারও কাছে সে আরাম বোধ করে না।

আপনি যদি গরীব মানুষদের জন্য কিছু করেন, তাহলে দেখবেন এটা করে যে আপনি আনন্দ অনুভব করবেন, সেটা আসলে অন্য কিছুতে পাবেন না। এটাই হচ্ছে প্রশান্তি। পক্ষান্তরে খেলা দেখা, ওয়েব সিরিজ দেখার আনন্দগুলো আসলে ডোপামিনের নিঃসরণ। এগুলো ক্ষণস্থায়ী সুখ। আর অপরের জন্য কিছু করার প্রশান্তিটা আপনার এই নফসকে শক্তিশালী করবে। তাই শুধু নিজের জন্য জীবনে বাঁচবেন না, অপরের জন্য কিছুটা হলেও সময় বের করুন। নিজের বাবাকে এটিএম আর মাকে ঘরের চাকরানী মনে করবেন না। ওনাদেরকে মা বাবা হিসেবে ট্রিট করুন। তাদের জন্য কিছু করুন। মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করুন, "আপনাদের কোনো সাহায্য করে দিতে পারি? রান্নাঘরের কোনো কাজ করে দিই? কোনো জিনিস কি এনে দেব?" অপরকে খুশি রাখুন এবং অপরের খুশিতে খুশি হতে চেষ্টা করুন। তাহলে এই নফস শক্তিশালী হবে। মানুষের উন্নতি দেখে সুখী হন। মানুষের উন্নতি দেখলে হিংসা করার চেষ্টা করবেন না।

এই জিনিস যখন আমরা করব, তখন আমরা অনেক রিল্যাক্সড থাকবো, খুশি থাকব এবং অন্তরে প্রশান্তি আসবে। আমরা যতই অপরজনের সাথে তুলনা করব, ছোট ছোট কথায় দুশ্চিন্তা করব, যতই আমরা নিজেদের জন্য বাঁচব, ততই আমরা অস্থিরতায় ভুগব। এখনকার সময়ে মানুষ এটাই ভাবে আমি, আমার নফস এবং

আমার আকাঙ্ক্ষাগুলো ঠিক থাকুক, বাকি যা আছে সব গোল্লায় যাক। আপনাকে এজন্য সৃষ্টি করা হয়েছিল যে আপনি যেন মানুষের মধ্যে খুশি বিলিয়ে দিতে পারেন এবং মানুষের জন্য সহজ করতে পারেন। এখনকার সময়টা ভালো করে লক্ষ করে দেখুন, আজকালকার ঘরে ঘরে ঝগড়া-বিবাদ, দ্বন্দ্ব চলছে। ভাইয়েরা মিলে ঝগড়াঝাঁটি করছে, ফলে মা-বাবারা পেরেশানিতে আছে। তাই মানুষের জন্য সহজ করুন, না হলে এটা আপনার দিকেই আবার ফিরে আসবে। আর একটা জিনিস মনে রাখবেন, আপনি আজকে মা-বাবার সাথে যে ব্যবহারটা করবেন, সে ব্যবহারটা আপনি আগামী দিন আপনার সন্তানদের মাধ্যমে ফিরে পাবেন। যদি বাচ্চারা না করে তাহলে সময় আপনার সাথে তেমনিই করবে। তাই এই নফসের উপরে কাজ করুন। যতক্ষণ মানুষকে নিয়ে না ভাববেন, ততক্ষণ পর্যন্ত এই নফস জাগ্রত হবে না এবং তাজকিয়ায়ে নফসও হওয়া সম্ভব না।

নফসে আম্মারা

এই 'নফস' মানুষকে মন্দ কাজে প্ররোচিত করে। এটি ব্যক্তিকে এমনভাবে বশীভূত করে যে, ব্যক্তির নিজের ওপর কোনো রকম নিয়ন্ত্রণ থাকে না। তার প্রবৃত্তি যা আদেশ করে সে তা-ই সম্পাদন করে, এর ওপর শয়তানের প্রবল প্রভাব বিরাজমান থাকে। ফলে এ নফস ব্যক্তিসত্তাকে সব ধরনের অন্যায়, অপকর্ম ও মন্দ পথের দিকে ধাবিত করে।

وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي ۚ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي ۚ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ

"আমি নিজেকে নির্দোষ বলি না। নিশ্চয় মানুষের মন মন্দ কর্মপ্রবণ কিন্তু সে নয়, যার প্রতি আমার পালনকর্তা অনুগ্রহ করেন। নিশ্চয় আমার পালনকর্তা ক্ষমাশীল, দয়ালু।" (সূরাহ ইউসুফ, ১২:৫৩)

ইমাম গাজালীর মতে নাফসে আম্মারা হচ্ছে পাগলা ঘোড়ার মতো। যদি তাকে বশে আনতে পারেন, তাহলে এটা আপনার গোলাম হয়ে যাবে। কিন্তু এটা যদি আপনাকে বশে নিয়ে আসে, তাহলে সেটা আপনাকে নিয়ে এমনভাবে দৌড়াবে, এমন নিচে নিয়ে যাবে যে আপনি চিন্তাও করতে পারবেন না। মানুষ তাদের চরিত্রের দৃঢ়তার অভাবে ব্যর্থ হয়, তাদের নিজেদের উপর নিয়ন্ত্রণ না থাকার কারণে ব্যর্থ হয়। কারণ নাফসে আম্মারা তাদের প্রভাবিত করেছে বেশি।

আজকের আধুনিক সভ্যতার সব ক্ষেত্রেই নফসে আম্মারা। সব দিকে খারাপ জিনিস দেখা যাচ্ছে। ইন্টারনেটের একেকটা ক্লিক, একেকটা ইউটিউব ভিডিও, মুভির দৃশ্য, একেকটা বিলবোর্ড আমাদের নফসে আম্মারাকে জাগিয়ে তোলে। সবজায়গাতেই এখন নফসে আম্মারা সক্রিয়। এটা যে আমাদের উপর প্রভাব বিস্তারকারী, তার প্রমাণ আপনাদের সামনে আছে। মানুষের চরিত্র এখন কত খারাপ হচ্ছে এবং কত স্ক্যান্ডাল বের হচ্ছে। কলেজ-ইউনিভার্সিটিতে কত কিছুইনা হচ্ছে এখন। টিচার-স্টুডেন্ট এর মাঝে এখন আর পার্থক্য নেই। টিচাররা স্টুডেন্টদেরকে স্টুডেন্ট মনে করে না একইভাবে স্টুডেন্টরাও শিক্ষকদের আর শিক্ষকদের মতো সম্মান করে না। কমবেশি সবাই পারভার্ট হয়ে গেছে। অনেক বড় বড় শয়তান আমাদের আশেপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর আজকালকের মিডিয়ার উপর তো আমাদের বিশ্বাসই হারিয়ে গেছে। এই মিডিয়াগুলোই আধুনিকতার নামে যত সব অশ্লীল কনটেন্ট দেখাচ্ছে।

আগে কোনো এক সময়ে মুরুব্বীরা একসাথে বসে বিবেককে জাগানোর বিভিন্ন ধরনের গল্প বলতেন। ভালো ভালো কথা বলতেন। এখন সে সিস্টেমটাই গায়েব স্মার্টফোনের কল্যাণে। মা-বাবা, সন্তান আলাদা আলাদাভাবে ব্যস্ত। ফলে মানুষ তো সহজেই খারাপের দিকেই যাবে। অপরের উপরে জুলুম করবে। নিজে বাঁচার চিন্তা করবে, অপরের কথা কি জন্যই বা খেয়াল করবে। এজন্য এই পাগলা ঘোড়াকে নিয়ন্ত্রণ করুন।

এই নফস নিয়ন্ত্রণে রাখতে হলে অবশ্যই খারাপ জিনিস থেকে আমাদের দূরে থাকতে হবে। যেমন ইউসুফ আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি যখন নারীরা মুগ্ধ হয়েছিল, তখন তিনি তাদের থেকে দূরে থাকতে কারাগারকেই উত্তম ভেবেছেন।

قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ ۖ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي
كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ

> “ইউসুফ বলল: হে পালনকর্তা তারা আমাকে যে কাজের দিকে আহ্বান করে, তার চাইতে আমি কারাগারই পছন্দ করি। যদি আপনি তাদের চক্রান্ত আমার উপর থেকে প্রতিহত না করেন, তবে আমি তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ব এবং অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব। (সূরাহ ইউসুফ, ১২: ৩৩)

এ আয়াত আমাদের এটাই শিক্ষা দেয় যে, এই খারাপ থেকে আমাদের পালিয়ে বাঁচতে হবে। আপনি যদি এদের সামনে চলে আসেন, তাহলে বাঁচতে পারবেন না।

এগুলোর ট্রিগার হচ্ছে মুভি, টেলিভিশন, ইন্টারনেট। মুভির মধ্যে এমন এমন কিছু দেখায়, যা আমাদের নফসে আম্মারাকে উস্কে দেয়। যেমনটা আজকের মিডিয়ায় অনেক বিজ্ঞাপনে অপ্রয়োজনে মেয়েদেরকে দেখায়। এর ফলে আমাদের মনে খারাপ ভাবনা আসে। তাই আমাদের পালিয়ে বাঁচতে হবে।

فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

"অতঃপর তার পালনকর্তা তার দোয়া কবুল করে নিলেন। অতঃপর তাদের চক্রান্ত প্রতিহত করলেন। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।"
(সূরাহ ইউসুফ, ১২:৩৪)

যখন খারাপ জিনিসের প্রভাব বেড়ে যাবে নিজেদের উপর, স্বভাবতই বান্দা তখন গুনাহের দিকে যাবে। অন্ধকার ও ধ্বংসের পথে চলে যাবে। তাই একবার আল্লাহকে ডাকুন। নিজের সকল সমস্যা আল্লাহকে বলে দিন। এটাই আল্লাহ তাআলার ওয়াদা। তিনি ইউসুফ আলাইহি ওয়া সাল্লামের দোয়া কবুল করেছেন, তিনি অবশ্যই আপনার কথাও শুনবেন। আল্লাহ জানেন আপনি কী নিয়ে স্ট্রাগল করছেন। যে আন্তরিকভাবে ডাকবে, তার দোয়া অবশ্যই কবুল করবেন তিনি। আমাদের সবার দ্বারাই কমবেশি গুনাহ হয়ে যায়। কিন্তু ওই গুনাহগার আল্লাহ তাআলার কাছে পছন্দনীয়, যে স্বীকার করে যে তার গুনাহ হয়েছে এবং সে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকতে চায়। স্বেচ্ছায় সে আল্লাহর মুখলিস বান্দা হতে চায়।

শেষ কথা

তো এই যে তিন নফস নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম, এর মধ্যে নফসে লাওয়ামা ও নফসে মুতমাইন্নাহকে আমাদের শক্তিশালী করতে হবে। নফসে লাওয়ামাকে যেভাবে বাড়ানো যায়, সেটা হচ্ছে জিকির করা বা এমন সব লেকচার শোনা, যেগুলো আমাদের বিবেককে জাগায়। এমন সব বই, গল্প পড়া যেগুলো অন্তরকে জাগ্রত করে। আর নফসে মুতমাইন্নাহকে জাগাতে দান-সাদাকা করুন, মানুষের মধ্যে খুশি আনুন। মানুষের খুশিতে খুশি হওয়ার চেষ্টা করুন। মানুষকে সাহায্য করার চেষ্টা করুন। নিজের রুটিনে কিছুটা চেঞ্জ করে কমিউনিটি সার্ভিস করার চেষ্টা করুন। আর নফসে আম্মারাকে আমাদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। না হলে এটা আমাদের ধ্বংস করে দেবে। এটাকে সবসময় আমাদের কাবু রাখতে হবে। ঐসব জিনিস থেকে দূরে থাকুন যেগুলো নফসে আম্মারাকে জাগিয়ে তোলে।

নফস নিয়ন্ত্রণ এসেছে কি না, এটা আমরা কীভাবে বুঝব? নফস নিয়ন্ত্রণে আসার নিম্নতম স্তর হচ্ছে তিনটি। কারো গীবত না করে তার প্রশংসা করা, মানুষের উপকার করা ও তার ক্ষতির চিন্তা না করা, কাউকে কষ্ট না দেয়া। নফস নিয়ন্ত্রণে থাকার উচ্চতর স্তর রয়েছে তিনটি। আখিরাতমুখী হওয়া, দুনিয়াবিমুখ হওয়া এবং মৃত্যুকে ভালোবাসা। যখনই এসব বৈশিষ্ট্য আমাদের মাঝে দেখতে পাবো, তখনই বুঝবো আমাদের নফসকে আমরা কাবু করতে পেরেছি। আর সবশেষে যতই বড় গুনাহ হয়ে যাক না কেন, আল্লাহ তা'আলার সাথে সব সময় সম্পর্ক রাখুন। আর আল্লাহকে বলুন যে আপনাকে যেন বাঁচিয়ে দেয়। তাহলে দেখবেন যে, আল্লাহ অলৌকিকভাবে আপনার জন্য রাস্তা খুলে দিচ্ছেন। তিনি আপনার জন্য এমন পথ খুলে দেবেন যার দ্বারা আপনি নিরাপদে থাকবেন। এটাই আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা। তাই আল্লাহর কাছে দোয়া করুন আমরা যেন তাজকিয়ায়ে নফস করতে পারি, নিজেদের নফসকে কাবু রাখতে পারি।

স্ক্রিন আসক্তি

Dogfooding (ডগ ফুডিং) শব্দটি কখনো শুনেছেন? ১৯৭৬ সালে Alpo dog food (যারা কুকুরের খাবার তৈরি করে) কোম্পানির জন্য একটি বিজ্ঞাপন বানানো হয়। সেই বিজ্ঞাপনটিতে অভিনেতা লরনে গ্রিন তার নিজের পোষা কুকুরকে সেই খাবার খাওয়ান। মূলত এটি ছিলো একটি বিজ্ঞাপনী কৌশল, যাতে দর্শকদের এই ধারণা দেয়া যায় এই প্রোডাক্টটা আসলেই ভালো। এখান থেকেই ডগফুডিং শব্দটির উৎপত্তি। ব্যবসায়ীরা তাদের নিজেদের প্রোডাক্ট নিজেরা ব্যবহার করে মানুষকে এটা বোঝানোর চেষ্টা করে যে, এই প্রোডাক্টটা আসলেই ভালো এবং তারা নিজেরাও এই প্রোডাক্টের উপর কনফিডেন্ট। আর এই স্ট্র্যাটেজিকেই ডগফুডিং স্ট্র্যাটেজি বলে।

এটা সব জায়গাতে একটা কমন প্র্যাকটিস। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রমও পাবেন। ব্যবসার সাথে জড়িত এমন অনেক লোক পাবেন, যারা তাদের নিজেদের প্রোডাক্ট ব্যবহার করে না। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে স্ক্রীন-ভিত্তিক টেক ইন্ডাস্ট্রি।

২০১০ সালে অ্যাপল যখন আইপ্যাড রিলিজ করলো, তখন স্টিভ জবস বলছিলেন আইপ্যাড হচ্ছে সবচেয়ে অসাধারণ ডিভাইস। তিনি আইপ্যাডের ব্যাপারে আরো যা বললেন,

“The best browsing experience you have ever had.”

“Way better than a laptop way better than a smartphone”

“It's an incredible experience”

তো এর বেশ কিছু দিন পরে নিউইয়র্ক টাইমসের এক সাংবাদিক ফোনে স্টিভ জবসের ইন্টারভিউ নিলেন। কথাবার্তার শেষ দিকে ঐ সংবাদিক বললেন, "আপনার বাচ্চারা নিশ্চয়ই আইপ্যাড অনেক পছন্দ করে।"

কিন্তু স্টিভ জবস যে উত্তর দিলেন, সেটা ঐ সাংবাদিককে বেশ অবাক করে দেয়। স্টিভ জবস বললেন,

"তারা এখনো সেটি ব্যবহার করেনি। আর বাচ্চারা বাসায় কতটুকু টেকনোলজি ব্যবহার করবে, সেটা আমরা নির্ধারণ করে দিই।"

এটা কিন্তু খুবই কমন একটা বিষয় টেক ইন্ডাস্ট্রিতে। সিলিকন ভ্যালির কাছেই Waldorf School of the Peninsula নামে একটি স্কুল আছে। সেখানে অষ্টম গ্রেডে না উঠা পর্যন্ত বাচ্চাদেরকে স্ক্রিন (অর্থাৎ ল্যাপটপ, আইপ্যাড, কম্পিউটার) দেয়া হয় না। সবচেয়ে মজার বিষয় হচ্ছে ওই স্কুলের ৭৫ ভাগ শিক্ষার্থীর বাবা-মা হচ্ছে সিলিকন ভ্যালির বিভিন্ন টেক কোম্পানির সিনিয়র এক্সিকিউটিভ। তাই সত্যিই ভাবা দরকার এই স্ক্রিন আমাদের সাথে ভালো কিছু করছে কি না।

আমেরিকার নিউইয়র্ক ইউনিভার্সিটির প্রফেসর অ্যাডাম অল্টার ২০০৭, ২০১৫ ও ২০১৭ সালে মানুষ কীভাবে সারাদিন সময় কাটায় তার উপর সমীক্ষা করেছিলেন। তিনি তাদের কাছে জানতে চেয়েছিলেন তারা তাদের ২৪ ঘন্টায় কী কী কাজ কত সময় ধরে করে।

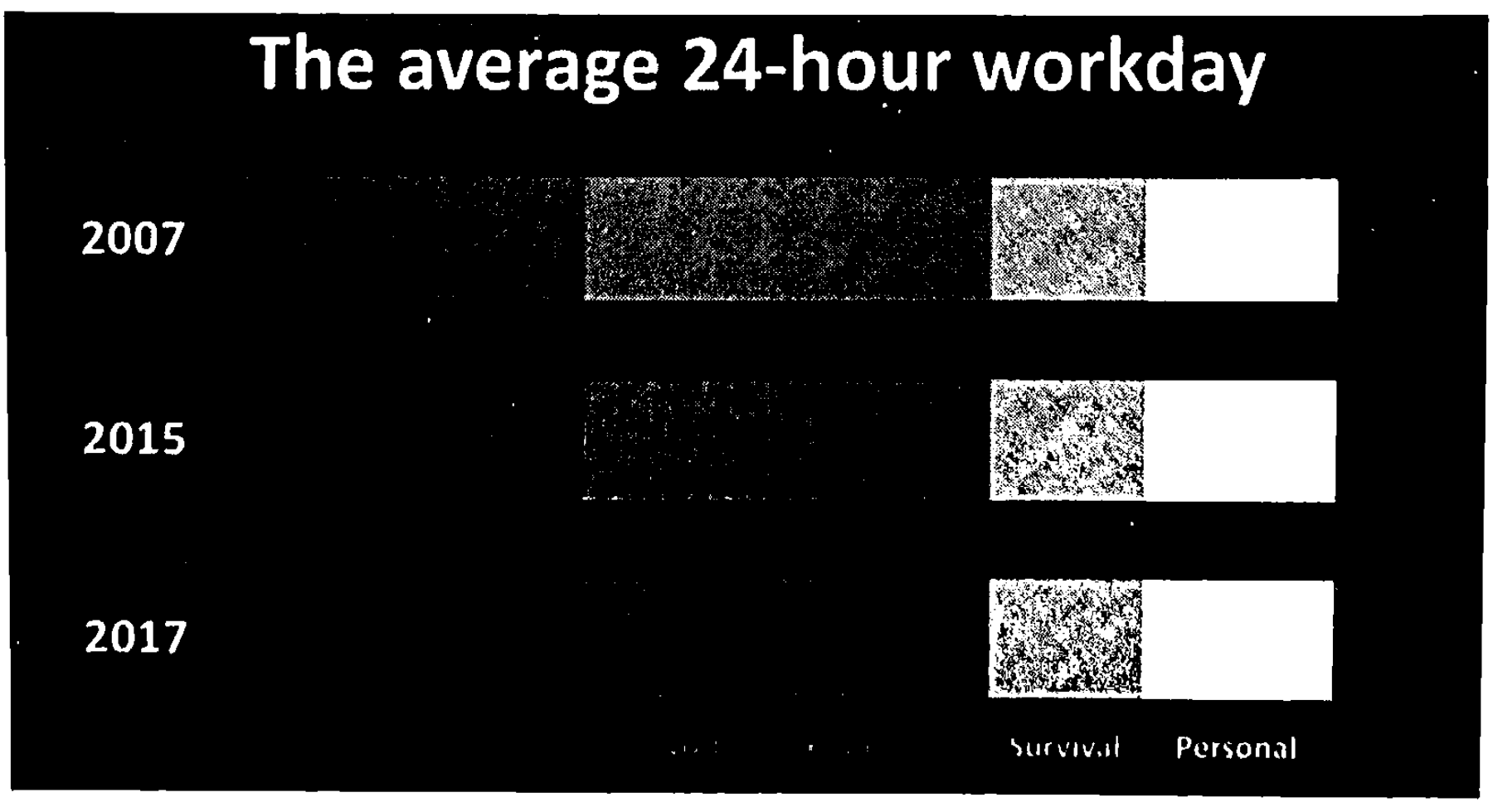

যদি ২৪ ঘন্টার মধ্যে আমাদের প্রতিদিনের রুটিনকে ভাগ করি তাহলে এর মধ্যে সাত থেকে আট ঘণ্টা থাকে ঘুমের সময় আর সেটা ২০০৭, ২০১৫ ও ২০১৭-এ প্রায় একই ছিলো। তারপর দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় কাজে আমরা সাড়ে আট থেকে নয় ঘন্টা সময় ব্যয় করি। যেমন অফিসে যাওয়া, স্কুল-কলেজে যাওয়া, নিজের ব্যবসায় সময় দেওয়া ইত্যাদি। তারপর সারাদিনের আড়াই থেকে তিন ঘন্টা সময় বিভিন্ন Survival activity করে থাকি। যেমন বাথরুমে যাওয়া, খাবার খাওয়া, দাঁত ব্রাশ করা ইত্যাদি। সেটাও ২০০৭, ২০১৫ ও ২০১৭ সালে খুব বেশি পরিবর্তিত হয়নি।

এভাবে সারাদিনের বিভিন্ন কাজের পরেও কিছু সময় বেঁচে যায়। এটাই আমাদের ব্যক্তিগত সময়। একটা মানুষ সারাদিন যতই ব্যস্ত থাকুক না কেন, নিজের মতো করে সময় কাটানোর জন্য ওই সময়টুকু তার কাছে থাকে। আর সেটা গড়ে দুই থেকে তিন ঘন্টার মতো। ঐ সময়টাতে সে কোনো বই পড়ে, দরকারি বা পেন্ডিং কোনো কাজ করে, কোনো শখের কাজ করে বা কারো সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলে। এই সময়টাতেই আমরা এমন কিছু করি, যা আমাদের ব্যক্তিসত্তা জাগিয়ে তোলে। এখানে আমরা আমাদের জীবন সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করি, সৃজনশীল হই। যেখানে আমরা জুম ব্যাক করি এবং আমাদের জীবন অর্থপূর্ণ হয়েছে কি না, তা খুঁজে বের করার চেষ্টা করি। তাই সময়টা আমাদের জন্য অবিশ্বাস্যভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে উনার রিসার্চ মোতাবেক, ২০০৭ সালে এই ব্যক্তিগত সময়ের প্রায় ৩০ থেকে ৪০ ভাগ সময় স্মার্টফোনের পিছনে ব্যয় করা হতো। আর ২০১৭ সালে এসে সেটা হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৯০ ভাগ। এটা হচ্ছে সেই সময়, যেখানে আমরা প্রডাক্টিভ অনেক কিছু করতে পারতাম। নিজের উন্নতি, কোনো স্কিল ডেভলপমেন্ট করতে পারতাম। কিন্তু না, ওই সময়টাতে আমরা স্মার্টফোন ব্যবহার করছি।

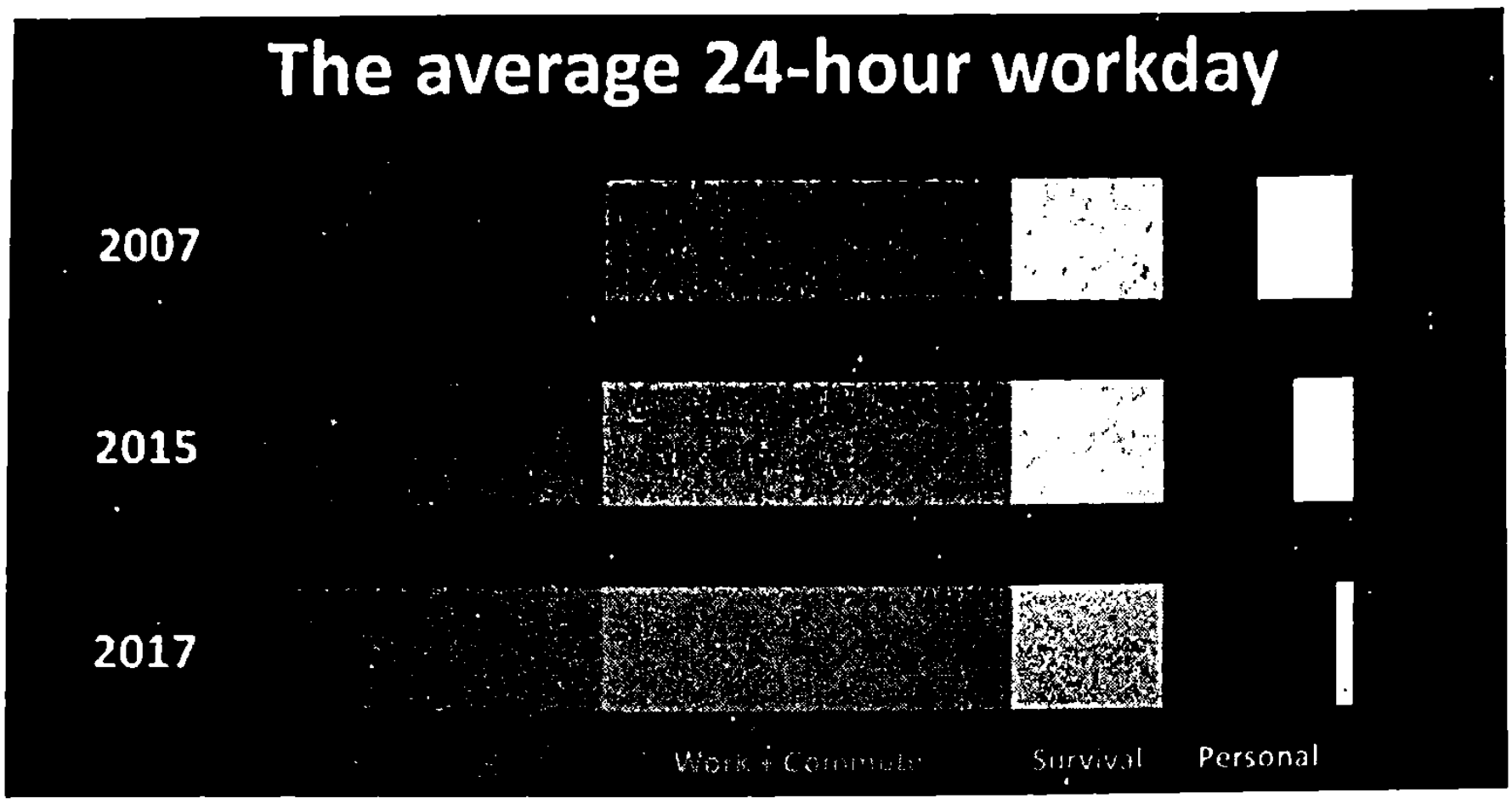

যদি স্মার্টফোনে কোনো প্রডাক্টিভ কাজ করতেন, তাহলে একটা কথা ছিলো। কিন্তু সমস্যার ব্যাপার হচ্ছে অধিকাংশ মানুষ আসলে কিছুই করছে না। শুধু ফেসবুক, ইউটিউব, হোয়াটসঅ্যাপ, ইমো, আরো যত সব অপ্রয়োজনীয় কাজ করছে। ফলে আপনার ব্যক্তিগত সময়টুকু নষ্ট হচ্ছে। খুবই চিন্তার ব্যাপার হচ্ছে আমাদের অবসর সময়ের ৯০ ভাগ সময়ই ব্যয় হচ্ছে এ জিনিসগুলোর পিছনে। সম্ভবত এ কারণেই আমরা দিনের পর দিন Insensitive হচ্ছি। এদের সাথে আমরা যতই সময় কাটাবো, ততই আমাদের বাস্তব জীবনের প্রতি উপলব্ধি কমতে থাকবে, আমরা অস্থির হতে থাকব। এটাই স্বাভাবিক।

আবার অতিরিক্ত সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারের ফলে মানুষ নার্সিসিস্ট হয়ে যায়। নার্সিসিজম মানে হচ্ছে নিজেকে নিজেই ভালোবাসা। মানুষ চায় তার প্রোফাইল পিকচারে যেন সবসময় প্রশংসা করা হয়। খাবার ততক্ষণ পর্যন্ত খাওয়া হয় না, যতক্ষণ না পর্যন্ত ছবি তুলে ফেসবুকে দেওয়া হয়। সে চায় মানুষ যেন সবসময় তার পোস্টে রিয়্যাক্ট দেয়, সবসময় তার প্রশংসা করে। যার ফলে সে সবসময় নিজের প্রশংসা খুঁজতে থাকে। এগুলো সবই নার্সিসিজমের লক্ষণ।

এখানে স্মার্টফোনের অতিরিক্ত ব্যবহারের উপর কিছু পরিসংখ্যান উল্লেখ করছি।

একজন মানুষ সারাদিনে গড়ে চার ঘন্টা স্মার্টফোনের পিছনে ব্যয় করে। একজন ব্যবহারকারী সারাদিনে ১৬০ বার অর্থাৎ প্রতি নয় মিনিটে একবার স্মার্টফোন হাতে নিয়ে ওপেন করে।

গড়ে ৮৬ ভাগ ইউজার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধবদের সাথে কথা বলার সময়েও তাদের ফোন চেক করে। এটা অনুচিত। কারণ কারো সাথে যখন আপনি কথা বলেন তখন তার সাথে মনোযোগী হয়ে আপনার কথা বলা উচিত। একজন ইউজার সারাদিনে ২৬১৭ বার ক্লিক, ট্যাপ, এবং সোয়াইপ করে।

প্রায় ৮৭ শতাংশ ইউজার ঘুমাতে যাওয়ার পূর্বে ও ঘুম থেকে উঠার এক ঘন্টার মধ্যে স্মার্টফোন ব্যবহার করে।

প্রায় ৬৬ ভাগ ইউজার স্মার্টফোন সাথে নিয়েই ঘুমায়।

৩২.৭ শতাংশ ইউজার তাদের পার্টনারের (স্বামী বা স্ত্রী) চেয়ে তাদের ফোনের সাথে বেশি সময় ব্যয় করে।

৮৭.৮ শতাংশ ইউজার তাদের ফোন বাসায় রেখে এলে দুশ্চিন্তা বোধ করে।

তাছাড়া যে সকল যুবক দৈনিক পাঁচ ঘণ্টার বেশি স্মার্ট ফোন ব্যবহার করে, তাদের আত্মহত্যা করার সম্ভাবনা ৭১ ভাগ বেশি। স্মার্টফোনের অতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে ডিপ্রেশনও বাড়ে। কারণ যারা স্মার্টফোন বেশি সময় ধরে ব্যবহার করে, তারা সাধারণত সোশ্যাল মিডিয়াই ব্যবহার করে। সেখানে অন্যের ছবি, স্ট্যাটাস দেখে সব সময় নিজের সাথে তুলনা করতে থাকে আর ভাবতে থাকে "তারা জীবনে কত সুখী, তারা কত আনন্দ করছে আর আমি কিছুই করতে পারছি না।" এটাই আমাদের বিষন্নতায় ভোগায়, দিনের পর দিন এগুলো দেখে আমাদের অন্তরে শূন্যতার সৃষ্টি হয়। এটাই মানুষকে হতাশাগ্রস্ত করে তোলে। আবার এই সোশ্যাল মিডিয়ায় অনেকেই প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে যায় এবং তার থেকেও ডিপ্রেশন চলে আসে।

যারা পাঁচ ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে স্মার্টফোন ব্যবহার করে, তাদের মধ্যে শতকরা ৫১ ভাগ ব্যবহারকারীর ঘুম ঠিকমতো হয় না। তারা গড়ে তিন থেকে চার ঘণ্টার মতো ঘুমায়। সবসময় স্মার্টফোনের সাথে লেগে থাকাটাই তাদের ঘুমাতে দেয় না।

প্রফেসর অ্যাডাম অল্টারের মতে, এত সময় ধরে এই অ্যাপগুলো ব্যবহার করার পরেও এগুলো আমাদেরকে খুশি রাখছে না। এর অন্যতম কারণ হচ্ছে এগুলো আমাদের থেকে Stopping Cues ছিনিয়ে নিয়েছে। অ্যাডাম অল্টারের মতে Stopping Cues হচ্ছে এমন একটি সিগন্যাল, যেটা আমাদেরকে নতুন কোনো কাজ শুরুর ব্যাপারে জানান দেয়।

Stopping Cues বিংশ শতাব্দীর সব জায়গায় ছিল। যেমন খবরের কাগজের কথাই ভাবুন। খবরের কাগজ পড়া শেষ হয়ে গেলে আপনি সেটাকে ভাঁজ করে অন্য জায়গায় রেখে দেন। ঠিক একই জিনিস কোনো ম্যাগাজিন বা বইয়ের সাথেও করা হয়। এগুলোর শেষ পাতা পড়ে ফেলার পর আপনি অন্য কাজের কথা ভাববেন। যখন ছোটবেলায় বিটিভিতে আমরা টিভি সিরিয়াল দেখতাম, তখন প্রতি সপ্তাহে একটিই পর্ব দেখান হতো। তো ওই পর্ব শেষ হয়ে গেলে আমরা পুরো সপ্তাহ জুড়ে অপেক্ষা করতাম নতুন পর্বের জন্য। এগুলোই হচ্ছে Stopping Cues. একটা কাজ করা শেষ, এখন আমাদের নতুন আরেকটি কাজ শুরু করতে হবে।

কিন্তু সমস্যা হচ্ছে এখনকার সোশ্যাল মিডিয়ায় কোনো Stopping Cues নেই। ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, টুইটার, ইউটিউবের নিউজফিডে একের পর এক কনটেন্ট লোড হচ্ছে তো হচ্ছেই। এই অ্যাপ ব্যবহারকারীরা স্ক্রল করতেই থাকেন, করতেই থাকেন। তখন না আশেপাশের কারো কথা খেয়াল থাকে, না সময়ের কথা।

সমাধান

প্রথমত, স্মার্টফোন বা টেকনোলজিকে একেবারেই ছেড়ে দেওয়া সম্ভবও না, সমাধানও না। আজকের দুনিয়ায় সোশ্যাল মিডিয়া ও ডিজিটাল মিডিয়ার ব্যবহার জানাই লাগে। কিন্তু আমরা এখানে আসক্তির কথা বলছি। কিছু প্রাক্টিক্যাল টিপস দিচ্ছি। আশা করি এগুলো আপনাদের সাহায্য করবে।

স্মার্টফোন আপনাকে অপশন দিয়েছে কোন নোটিফিকেশনগুলো আসবে আর কোনগুলো আসবে না। সেটিংসে গিয়ে সেগুলো বন্ধ করা যায়। যেমন ফেসবুকে বারবার নোটিফিকেশন আসতেই থাকে। অমুকে কমেন্ট করেছে, আপনাকে কেউ ট্যাগ করেছে বা আপনার ছবিতে কেউ লাইক দিয়েছে ইত্যাদি। মানুষের মনোযোগ নষ্ট হয়ে যায় তখন। তাই প্রথম উপদেশ হচ্ছে অপ্রয়োজনীয় নোটিফিকেশনগুলো বন্ধ করুন। শুধুমাত্র সেগুলোই অন করে দিন, যেগুলো আপনি জরুরি মনে করেন।

ফেসবুকে লাইক করে রাখা অপ্রয়োজনীয় পেজগুলো আনলাইক করে দিন। তাহলে হোমপেজ স্ক্রল করতে থাকলেও সেগুলো আপনার সামনে আসবে না। এমন পেজগুলোকেই শুধু ফলো করুন, যেগুলো থেকে আপনি উপকৃত হবেন।

ফ্রেন্ডলিস্টে যাদের পোস্ট থেকে আপনি কল্যাণকর কিছু পান না, তাদেরকে আনফ্রেন্ড বা নিদেনপক্ষে আনফলো করে দিন। কারণ, সামনে চলে আসা স্ট্যাটাসের সাথে হয়তো আপনি দ্বিমত পোষণ করেন বা আপনার পছন্দের কারো সমালোচনা করা হয়েছে। তখন আমাদের মাথায় রাগ উঠে যায়। আমরা কমেন্ট সেকশনে গিয়ে ঝগড়া করা শুরু করি। সেই ঝগড়া বাড়তে বাড়তে না জানি কোথায় চলে যায়। মোটকথা তখন আমাদের উপর ওয়াজিব হয়ে যায় তার প্রত্যেকটা কথার জবাব দেওয়া। তাই আনফ্রেন্ড বা আনফলো অপশানগুলো খুবই কার্যকর।

ফেসবুক তখনই ব্যবহার করুন, যখন আপনার জরুরী কোনো পোস্ট বা মেসেজ চেক করতে হয়। জীবনে যারা সফল হয়েছে, তারা কি সবসময় আমাদের মতো ফেসবুকে ঘন্টার পর ঘন্টা স্ক্রল করতে থাকে? অবশ্যই না। তাদের এই জগতে বিচরণ সাময়িক ও সংক্ষিপ্ত। সেই অভ্যাসটা আমাদেরও গড়ে তুলতে হবে।

যাদের মাত্রাতিরিক্ত চ্যাটিংয়ের অভ্যাস আছে, তারা এর জন্য একটা ফিক্সড টাইম রাখুন। সম্ভব হলে চ্যাটিং অ্যাপগুলো আনইন্সটল করে দিন। একটা সময় ছিল যখন চ্যাটিং করতে হলে মানুষকে কষ্ট করে সাইবার ক্যাফে পর্যন্ত যাওয়া লাগত। মানুষদের জানিয়ে দিন আপনি কোন কোন সময়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় অ্যাকটিভ থাকবেন এবং ঐ সময়ে যেন আপনাকে মেসেজ দেয়। নোটিফিকেশান আসামাত্রই সেটা চেক করতে না পারলে দুনিয়া উল্টে যায় না।

দিনে একটা সময় নির্ধারিত রাখুন যে সময়টাতে আপনি ফেসবুক বা অন্যান্য সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করবেন। যদিও অনেক সময় সেটা সম্ভব হয় না। অনেকেই বলেন "আমি দিনের অমুক অমুক সময় ফোন ব্যবহার করব না।" ধরলাম রাতের ছয়টা থেকে আটটা পর্যন্ত। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে ছয়টা থেকে আটটার সময় বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন রকম হয়। কোনো দিন হয়তো আপনি বাসায় থাকেন, কোনোদিন রেস্টুরেন্টে। তাই সময়ের পরিবর্তে কাজ অনুযায়ী নিয়ম করতে পারেন। যেমন- খাবার সময়, মানুষের সাথে কথার সময় এবং রাতে ঘুমানোর আগে ফোন ব্যবহার না করা।

পরিবারের জন্য আলাদা সময় বরাদ্দ রাখুন। কখনো তাদের সামনে স্মার্টফোন ব্যবহার করবেন না এবং এটা আপনার ব্যাপারে ভালো ইম্প্রেশনও দেয় না। বরং এমনটাই মনে হয় যে আপনি একজন কেয়ারলেস মানুষ।

মাঝে মাঝে ওয়াইফাই ও মোবাইলে ডেটার অপশনটি অফ করে দিন। তাহলে অনেক সময় রিল্যাক্সে থাকতে পারবেন। ইন্টারনেট অফ রেখে শুধু ফোন অন রাখুন। আপনার অনেক টেনশন, স্ট্রেস কমে যাবে। রাস্তায় হাঁটা বা যানবাহন চালানোর সময় মোবাইল ফোন ব্যবহার মানেই দুর্ঘটনার সম্ভাবনা। তাই এই সময়গুলোতে ফোন থেকে বিরতি নিন।

রাতে ঘুমানোর আগে শেষ এক ঘন্টা কোনোভাবেই স্মার্টফোন ব্যবহার করবেন না। বিষয়টা যদিও অনেক কঠিন, কিন্তু আসক্তি থেকে বাঁচতে চাইলে এটাই হচ্ছে সমাধান। এর পরিবর্তে কোনো বই পড়ার চেষ্টা করুন বা ওজু করে কুরআন তেলাওয়াত করুন। দেখবেন অনেক রিল্যাক্স ফিল করবেন এবং ঐসব ফিতনা থেকে বেঁচে যাবেন।

জীবনে চলার পথে অনেক জিনিসই ম্যানেজ করার দরকার পড়ে, আবার অনেক জিনিস আমাদের উপর প্রভাব বিস্তার করে। তাই এই প্র্যাক্টিক্যাল টিপসগুলো ফলো করার চেষ্টা করুন, যাতে এই আসক্তি থেকে আস্তে আস্তে বেঁচে থাকতে পারেন। এই আনপ্রোডাক্টিভ লাইফ থেকে একটি প্রোডাক্টিভ লাইফস্টাইলের দিকে যেন যেতে পারেন। যাতে নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে এগিয়ে যেতে পারেন। আল্লাহ তাআলা আমাদের স্মার্টফোনের ফিতনা থেকে বেঁচে থাকার তৌফিক দিন। এর পাশাপাশি পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের প্রতি খেয়াল রাখুন এবং তাদেরকে ফিতনা থেকে বেঁচে থাকার উপদেশ দিন।

দুঃখবোধ

আপনার সময় এখন কেমন যাচ্ছে? হয়তো কারো এখন ভালো যাচ্ছে বা কারো খারাপ। আমাদের এই জীবনটা কোনো না কোনোভাবে কেটেই যাবে। আমাদের জীবনটাই একটা পরীক্ষা। এক বাদশা তার উজিরকে বললেন, "আমাকে এমন কোনো উপদেশ দিন, যার ফলে সুখের সময়ও নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারব, আবার দুঃখের সময়ও পারব।"

তা শুনে উজির বললেন, "সব সময় এটা মনে রাখুন, এই সময়টা কেটেই যাবে।"

তাই জীবনের সুখে-দুঃখে সবসময় মনে রাখুন, এই সময়টা কেটে যাবে। জীবনে উত্থান-পতন আসতেই থাকবে। হতে পারে সুখের সময়ের পরে দুঃখ আসবে এবং দুঃখের পর সুখ। আর এই ফিলোসোফি আমাদেরকে কুরআনও দেয়।

আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেন,

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ

"অবশ্যই আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি বিপদ-কষ্টের মধ্যে।" (সূরাহ বালাদ, ৯০:৪)

এই পৃথিবীটা আমাদের জন্য এক কঠিন সফর। এই দুনিয়াটা এমন একটা জায়গা, যেখানে আমাদের এই জীবন কাটানোটাও কিন্তু সহজ নয়। দুনিয়াতে দুঃখ আছে। নানান বিষয় থেকে এই দুনিয়াতে আমাদের দুঃখ কষ্ট আসবে। হতে পারে একের পর এক আসতেই থাকবে। মানুষ কখনো কখনো মনে করে এই সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। কিন্তু তারপরে আরেকটা সমস্যা চলে আসে। এটার সমাধান হলে আসে তৃতীয় আরেকটা। তারপর চতুর্থটা। এভাবে আসতেই থাকে। তাই বিপদ-আপদ,

বালা-মুসিবত জীবনে অবশ্যই আসবে। আর এগুলো হতে মানুষের জীবনে দুঃখবোধ অনুভূত হতে পারে, এটাই স্বাভাবিক।

কিন্তু দুঃখবোধের সাথে ডিপ্রেশনকে মিলিয়ে ফেলবেন না। কারণ দুঃখবোধ এবং ডিপ্রেশন—এই দুটার মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে।

দুঃখের সীমানা থেকে নবীরাও পার হতে পারেননি। দ্বীনের মধ্যে আসার মানে এই নয় যে, মানুষ শুধু সুখের মধ্যেই থাকবে। বরং দ্বীনদারের জন্য আল্লাহ যেটার ওয়াদা করেছেন, তা হলো প্রশান্তি। সুখে থাকাটাই কিন্তু জীবনের মূল লক্ষ্য নয়। কম-বেশি সব নবীই দুঃখ-কষ্ট সহ্য করেছেন, কিন্তু তাঁদের অন্তরে প্রশান্তি ছিল। ছিল পরিতৃপ্তি এবং সন্তুষ্টি।

মানুষের মধ্যে যে কয়টি বেসিক ইমোশন থাকে, তার মধ্যে দুঃখবোধ একটি। দুঃখবোধের সাথে অনেক সময় অনেক রাগও আসে। দুঃখ এবং রাগ যেন একে অপরের সাথে লড়াই করে কে জিততে পারে।

সাইকোলজিস্টদের মত অনুযায়ী Sadness বা দুঃখবোধের সংজ্ঞা হচ্ছে

> *"Sadness is an emotional pain associated with, or characterized by, feelings of disadvantage, loss, despair, grief, helplessness, disappointment and sorrow"*
>
> (https://en.wikipedia.org/wiki/Sadness)

আর দুঃখবোধের ফলাফল হচ্ছে নৈরাশ্য, মর্মপীড়া, অসহায়তা, বিমর্ষতা, মনস্তাপ এবং আশাভঙ্গ হওয়া। দুঃখবোধ মানুষের মধ্যে ন্যাচারাল জিনিস। যদি এটাকে আপনি ঠিকভাবে ম্যানেজ করতে না পারেন, কারো সাথে শেয়ার না করেন, বা Let it go না করেন, তাহলে এটি আপনার ভেতরে অনেক আঘাত দিবে। হ্যাঁ, মানুষের আবেগকে ম্যানেজ করতে হয়, এগুলোকে ধ্বংস করা যায় না। তাই আমাদের জানতে হবে কীভাবে দুঃখবোধকে ম্যানেজ করা যায়।

দুঃখবোধের ধরন

১) লো স্পিরিট:

কখনো কি আপনার এমন মনে হয়েছে যে, কোনো কাজ করার জন্য নিজেকে নিজে টেনে দাঁড় করাতে পারছেন না? যদি কোনো এক জায়গায় বসে যান, তাহলে বসেই থাকেন। অনেক কষ্টে নিজেকে উঠিয়ে আরেক জায়গায় নিয়ে যেতে হয়। এটাই লো স্পিরিট।

এটা কমবেশি আমাদের সবার সাথেই হয়। কিন্তু এটা যদি নিয়মিত হতে থাকে, যেমন দশ-বারো দিন বা কয়েক মাস পর্যন্ত, তাহলে খুবই চিন্তার বিষয়। কখনো কখনো আমাদের সবারই কমবেশি স্পিরিট লো হয়ে যায়। লো স্পিরিটের মানেই হচ্ছে মোটিভেশনের অনুপস্থিতি।

২) নৈরাশ্য:

Despair এর মানে হচ্ছে নিরাশ অথবা আশাহত হওয়া। আল্লাহ তা'আলা কুরআনে বলেন:

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

"বলুন, হে আমার বান্দাগণ যারা নিজেদের উপর জুলুম করেছ, তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ সমস্ত গোনাহ মাফ করেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (সূরাহ যুমার, ৩৯:৫৩)

আবার আরেক আয়াতে আল্লাহ বলেন:

وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ ۖ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ

"আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহর রহমত থেকে কাফের সম্প্রদায় ব্যতীত অন্য কেউ নিরাশ হয় না।" (সূরা ইউসুফ, ১২:৮৭)

যখন আপনি এই ভেবে নিজে থেকে হাল ছেড়ে দেন যে এখন আর আপনাকে দিয়ে কিছু হবে না, যেভাবে জীবনটা কাটছে সেভাবেই কাটতে থাকুক, তখন নিজের মধ্যে আশার আলো নিভে যায়। কিন্তু কারা এই অবস্থার সম্মুখীন হয় বেশি? যেমন তরুণদের মধ্যে যখন কেউ কারো সাথে আবেগের সম্পর্কে জড়িয়ে যায়, কিন্তু সেখান থেকে বনিবনা হয় না বা ব্রেকআপ হয়ে যায়। তখন মানুষ আশাহত হওয়ার এমনই এক অবস্থায় চলে যায়। আশেপাশের সবার সাথে সম্পর্কে সে কেমন নিভু নিভু অবস্থায় থাকে এবং তার জীবন স্বাভাবিকভাবে অতিবাহিত করতে পারে না। বিয়ে বা বাবা মায়ের সাথে সম্পর্ক ফাংশনাল করার জন্য মানুষের যেটা দরকার, সেটা করার মতো অবস্থায় থাকে না তখন। কারণ সে নিজের ভেতরে নিজে হেরে যায় এবং হাল ছেড়ে দেয়।

৩) অন্ধকারাচ্ছন্ন বোধ করা

এটি হচ্ছে মনের মধ্যে অন্ধকার অনুভব করা। দিনের মধ্যে আপনার রাত অনুভূত মনে হয় এবং আপনি সব সময় চিন্তার মধ্যে ডুবে থাকেন। হয়তো আপনার চারপাশে অনেক হৈ-হুল্লোড় বা বিনোদন হচ্ছে। কিন্তু আপনার ভেতরে চলছে অন্ধকার। আপনার ভেতরটায় সকাল হচ্ছে না। আকাশ যেরকম কালো মেঘে ছেয়ে যায়, ঠিক তেমনটাই আপনার ভেতরে অনুভূত হয়। মনের ভেতরে যেন অনেক বড় ঝড় চলছে। আপনি যেন থেকেও নেই। হতে পারে দুর্ভাবনার জিনিসটা বড় নয়। কিন্তু সে নিজের জন্য জিনিসটা অনেক বড় করে ফেলেছে। এখন যেহেতু জিনিসটা তার জন্য অনেক বড় হয়ে গেছে, সে সবসময় সেটার ব্যাপারে ভাবতে থাকে। সেজন্যই তার মনের ভেতরে অন্ধকার জমে থাকে। হতে পারে এটা অতীতের কোনো দুর্ঘটনা বা ভুল সিদ্ধান্ত। এখন সেই ভুল সিদ্ধান্তের পরিণতি তাকে ভোগ করতে হচ্ছে। বাইরে থেকে তাকে দেখতে যতই ভালো দেখাক না কেন, তার ভেতরটা অন্ধকারে ছেয়ে গেছে।

৪) শূন্যতা বোধ করা

এর মানে হচ্ছে ভেতরে ফাঁকা অনুভব করা। সবকিছু হাতে থাকার পরেও মানুষ ভেতরে শূন্যতা অনুভব করে। ভালো অবস্থায় থাকার পরেও মনে হয় কিছু একটা নেই, কিন্তু কী নেই তাও অজানা। অন্তরের এই শূন্যতা এতটাই ভয়াবহ যে, এটা

মানুষকে সুইসাইডের দিকে পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারে। যদি ইসলামিক পার্সপেক্টিভ থেকে বলি, তাহলে এটা হচ্ছে আপনার রূহের চিৎকার। রূহ চিৎকার করে কিছু বলার চেষ্টা করছে, কিন্তু মানুষ সেটা শুনছে না। কারণ বস্তুগত জিনিসে রূহের ক্ষুধা মিটে না। যখন আপনি বস্তুগত দেহকে অনেক সময় দিবেন এবং স্পিরিটকে সময় দেবেন না, তাতে ইমব্যালেন্স হবে। ঠিক একইভাবে রূহকে অনেক সময় দিয়ে দেহ বা দুনিয়াবী বিষয়ে সময় না দিলে সেটাও ইমব্যালেন্স।

দেহ শুকিয়ে গেলে চোখে দেখা যায়, কিন্তু রূহের কান্না সবাই বোঝে না। রূহ আল্লাহ তা'আলার সাথে সম্পর্কের জন্য কাঁদছে। তখন মানুষ হঠাৎ করে গম্ভীর হয়ে যায় এবং মনে হয় কিছু একটা নেই।

৫) বিষাদ

এ পাঁচটি ধরনের মধ্যে এটাই সবচেয়ে শক্তিশালী ধাপ। বিষাদ বা মনস্তাপ কখন হয়? প্রকৃতপক্ষে এটি কোনো কিছু হারানোর সাথে সম্পর্কিত। পছন্দের কেউ হারিয়ে যাওয়া বা চলে যাওয়া বা কোনো লস হয়ে যাওয়া, সেটা যেকোনো কিছু হতে পারে। তখন বিষাদ আসে। ধরুন আপনি কোনো কিছুর ব্যাপারে প্রত্যাশা করে আছেন কিন্তু সেটা পেলেন না বা আপনার মনমতো হলো না। তখনই বিষাদ আসে। ভালোবাসার মানুষটির মৃত্যু বা অ্যাক্সিডেন্টও বিষাদের কারণ।

সাইকোলজিতে বিষাদের বিভিন্ন স্টেজ আছে। এখন আমরা সেই ধাপগুলো সম্পর্কে জানব। প্রায় প্রত্যেক মানুষই একেকটি ধাপ অতিক্রম করে। কিন্তু কেউ যদি সেই ধাপগুলো অতিক্রম না করে তাহলে তার কনফ্লিক্টগুলো unresolved অবস্থায় থেকে যায় এবং সে কনফ্লিক্টগুলো তাকে সারা জীবনভর বিরক্ত করে। কেউ কেউ হয়তো পুরো সাতটি ধাপ এক দিনেই পার করে ফেলে। যারা মানসিকভাবে শক্ত, আল্লাহওয়ালা লোক তারা এরকম Strong হয়। আবার কেউ কেউ এক ধাপেই দশ বছর পার করে দেয়। আবার কেউ কেউ সারা জীবনভর একটা স্টেজেই পড়ে থাকে।

আঘাত এবং অস্বীকার (Shock and Denial)

ধরুন আপনি একটা ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন। অথবা আপনাকে কেউ ধোঁকা দিয়েছে, প্রতারণা করেছে। কিংবা প্রিয় কোনো মানুষের মৃত্যু হলো। এতে সবার আগে আপনার যে রিয়্যাকশনটা হবে, সেটা হচ্ছে Shock and denial। প্রথমে প্রচণ্ড মানসিক আঘাত পায়। তারপর ধরে নেয় তার সাথে এমনটা হতেই পারে না, কোথাও কোনো ভুল হচ্ছে, ইত্যাদি।

ব্যথা এবং অপরাধবোধ (Pain and Guilt)

একটা সময়ে মানুষ বুঝতে পারে যে, ঘটনাটা আসলেই ঘটে গেছে। এটা দ্বিতীয় ধাপ, Pain and Guilt। মানুষ ভেতরে ভেতরে অনেক কষ্ট পায় এবং তার মাঝে এই অনুশোচনাবোধ জাগে "আমি এটা কীভাবে করতে পারলাম? আমার কি কোনো ভুল ছিল তখন? আমি কি তখন ভেবে দেখিনি?" এটাই সেই মুহূর্ত, যখন শয়তান পুরোদমে সক্রিয় থাকে। এরপরে শয়তান তাকে এমন হতাশাগ্রস্ত অবস্থায় ফেলে দেয়, যাতে সে এই দুঃখ থেকে আর বেরই হতে না পারে। এই ধাপে মানুষ নিজেকে নিজে দোষ দেয়, কেন আগে এটা ভেবে দেখেনি। যদিও সে চিন্তা ভাবনা করেছে এবং হয়তোবা ইস্তেখারা করেছে। সে নিজের পক্ষ থেকে অনেক ভেবেচিন্তে ডিসিশন নিয়েছে। মানুষদের সাথে আলোচনাও করেছে। এখন সবকিছু ভুলে গিয়ে শয়তান তাকে এটার উপরে ফোকাসড রাখে যে, হয়তো সে নিজে থেকে ভালো করে এটা ভেবে দেখেনি। যদি সে ঐভাবে করতো তাহলে ঐ রকম হতো। তখন মানুষের নিজের মধ্যে একটা যুদ্ধ চলে এবং সেই যুদ্ধ মানুষ নিজেই অনুভব করতে পারে। বাইরের মানুষের চোখে সেটা ধরা পড়বে না সেটাই স্বাভাবিক।

রাগ এবং দর কষাকষি (Anger and Bargaining)

আর যদি এই Pain and Guilt এর ধাপ ঠিকমতো পার করে এবং ধৈর্য দেখায়, তাহলে এর পরবর্তী ধাপ হচ্ছে Anger and Bargaining। এই স্টেজে তার নিজের উপর অনেক রাগ আসে। সে ভাবতে থাকে এটা সে কীভাবে করলো। তখন bargain করে। অর্থাৎ, এমন কোনো একটা রাস্তা খুঁজে পাওয়ার জন্য

মরিয়া হয়ে যায়, যা তাকে এই দুঃখ থেকে বের করে আনবে। সেই রাস্তা পাওয়ার বিনিময়ে দরকারে সে দুনিয়ার সকল সম্পদ খরচ করে ফেলতেও রাজি হয়ে যাবে।

ডিপ্রেশন, ভাবনা ও একাকীবোধ (Depression, Reflection & Loneliness)

তারপর চিন্তা করতে করতে, এনালাইসিস করতে করতে একসময় সে ক্লান্ত হয়ে যায়। বুঝতে পারে তার বার্গেইনিং ভাবনার সবই অবাস্তব। এই ধাপে এসে মানুষ অবশেষে দুঃখের প্রকৃত মাত্রা বুঝতে পারে।

ঘুরে দাঁড়ানো (The Upward Turn)

এই ধাপে মানুষ ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করে। কিন্তু যদি সে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা না করে এবং তার নিজের মধ্যে আগের চারটা ধাপের বারবার রিপিটিশান হয়, তাহলে আমরা বলতে পারি সে ডিপ্রেশনের দিকে যাচ্ছে।

পুনর্গঠন এবং মানিয়ে নেয়া (Reconstruction and Working Through)

এই ধাপে মানুষ বাস্তবমুখী হওয়া শুরু করে। সে বাস্তবতার সাথে মানিয়ে নিতে শুরু করে। দুর্ঘটনা তো ঘটেই গেছে, যা হওয়ার তা তো হয়েই গেছে। এরকম ঘটনা তো অনেক মানুষের সাথেই হয়। আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া এবং সে এটাকে সমাধান করার চেষ্টা করে। হয়তো এটাকে নিয়ে তাদের বাঁচতে হবে অথবা সে এটাকে সমাধান করার চেষ্টা করে। তা না হলে সে এই দুঃখ নিজের ভেতরে পুষে রেখে নিজেকে নিজে ধ্বংস করে দিত। আশেপাশের লোকদেরকেও প্রভাবিত করে ছাড়ত। এই ধাপে এসে মানুষ ধীরে ধীরে ভালোর দিকে যায়। প্রথমদিকে সে তার সমস্যাগুলোর সাথে যুদ্ধ করলেও এখন সে সমস্যাগুলোর সাথে নেগোসিয়েশন করে। "এই সমস্যাগুলো নিয়েই আমার বাঁচতে হবে, চলতে হবে।" যেমন আল্লাহ তা'আলা হয়তো কাউকে এমন সন্তান দিয়েছেন, যার কোনো শারীরিক বা মানসিক সমস্যা আছে। প্রথমে সে এটাতে অনেক কষ্ট পাবে। তারপর তার ভেতরে অনুশোচনাবোধ আসে যদি সে অমুক কাজ করতো বা যদি সে

ঠিকমতো কেয়ার নিত। তারপর সে ধীরে ধীরে এটাকে মেনে নেয় এবং পজিটিভ দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখতে শুরু করে।

জীবনের যেকোনো ঘটনাকে পজিটিভ দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখাটা খুবই জরুরী। তাই আপনার মনকে সেভাবে ট্রেইন করুন এবং নিজের মনকে বারবার বোঝানোর চেষ্টা করুন। আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক মানুষের জীবনে কোনো না কোনো সমস্যা রেখেছেন। তাই এই সমস্যাগুলোর সাথে যতই যুদ্ধ করবেন, ততই সে সমস্যাগুলো আপনার উপর ভারী হয়ে যাবে। তাই আপনার সমস্যাগুলোকে নিয়ে কাজ করা শুরু করুন। নিজের মনকে বোঝান এই সমস্যাগুলো নিয়েই আপনাকে চলতে হবে।

মেনে নেয়া এবং আশা (Acceptance and Hope)

কেউ কেউ অবশ্য Shock and Denial থেকে সরাসরি এই ধাপে চলে আসে। কারণ তারা মানসিকভাবে অনেক শক্ত। তারা জানে সকল সমস্যারই কোনো না কোনো সমাধান আছে এবং তারা এটাকে মেনে নেয়। এখন Acceptance এর মানে এইটা নয় যে আপনি হাল ছেড়ে দিবেন। কেউ যদি ভেবে থাকে, "আমি তো এরকমই। আমার ক্ষেত্রেই এ সমস্যা হয় এবং আমি তো সমাধান করতে পারি না। আমি তো সবসময় ব্যর্থ হয়েছি।" এটা কিন্তু Acceptance নয়।

Acceptance মানে হচ্ছে সামনে এগিয়ে চলা। যা হয়ে গেছে, তা তো হয়েই গেছে। এখন সামনের দিনগুলো নিয়ে ভাবতে হবে। কারণ এরপরে তো আরো অনেক জিনিস করার বাকি আছে। একটা জিনিসের উপরে যদি কান্নাকাটি করেন, তাহলে বাকি জীবন কীভাবে চলবে?

আমরা যেমন একটা কৌতুক শুনে বারবার হাসি না, ঠিক একইভাবে একই ধরনের দুঃখ বারবার আসলে আমরা কেন হাল ছেড়ে দিব? তখন সে আশার আলো খুঁজে নেয় এবং বাকি জীবনের পথ চলতে শুরু করে।

এই ধাপগুলো আমরা সবাই কম বেশি পার করে থাকি। কিন্তু ইসলামের কথা হচ্ছে প্রথমেই যেন একসেপ্ট করে নেন। মুমিনের মনে 'শক' এর পরপরই সবর চলে আসা উচিত। সকল মানুষই এই স্টেপগুলো পার করে। কিন্তু ইসলাম আপনাকে দ্রুত ধাপগুলো পার হতে সহায়তা করে। যদি আপনার মধ্যে ইসলামি জ্ঞান এবং সঠিক আকিদা থাকে, তাহলে কয়েকদিন না, কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ঘুরে দাঁড়াবেন।

এজন্যই দ্বীনী ইলম হাসিল করুন, যাতে এই জিনিসগুলো থেকে সহজে বের হয়ে আসতে পারেন।

দুঃখবোধের কারণ

বিভিন্ন কারণেই দুঃখবোধ আসতে পারে। তবে এখানে প্রধান পাঁচটি কারণ উল্লেখ করছি।

১) অপরকে অনুকরণ করা

অনেক মানুষের দুঃখের কারণ হচ্ছে তারা তাদের নিজেদের স্ট্যান্ডার্ড অপর মানুষের দেখাদেখি বানিয়েছে। এখন সেগুলো মেনে চলা, সেগুলোর সাথে তাল মিলিয়ে চলাটা তাদের জন্য কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। মানুষ একরকম হতে চায়, কিন্তু বাস্তবে সে ঐরকম নয়। অধিকাংশ তরুণের সাথে এরকম হচ্ছে। তার কারণ আমরা মানুষদের সাথে অধিক তুলনা করি। অমুকের কাছে এইটা আছে, তমুকের কাছে সেইটা আছে, এভাবে আরেকজনের লাইফস্টাইল অনুকরণ করে আমরা সোনার খাঁচায় আটকে যাই।

ধরুন একই অফিসে দুইজন কলিগ আছে। দুইজন একই পজিশনে রয়েছে। এর মধ্যে একজনের ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড খুবই ভালো। গাড়িও আছে তার। অপর কলিগ ভাবলো, তার কাছেও এখন গাড়ি থাকা দরকার। যেহেতু দুইজন একই পজিশনে চাকরি করে। কিন্তু সে এটা দেখেনি যে, তার কাছে গাড়ি কেনার মতো প্রয়োজনীয় অর্থ বা সেই গাড়ি মেইনটেইন করার সামর্থ্য আছে কি না। সে এটাও ভেবে দেখেনি যে, তাদের দুজনের ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড সমান না। সে শুধু গাড়ির কথাই ভেবেছে। এখন সে যেটা করবে, তা হচ্ছে ব্যাংক থেকে লোন নিয়ে গাড়ি কেনার চেষ্টা। তার বস যদি কোনোভাবে এটা জেনে যায়, তাহলে সেই এমপ্লয়ির কাছে থেকে অতিরিক্ত কাজ করিয়ে নেয়ার চেষ্টা করবে। কারণ প্রতি মাসে তাকে অবশ্যই ব্যাংকের কিস্তি দেওয়া লাগবে। সে জন্য তার চাকরি থাকাটা অনেক দরকার। তাই সে তার বসকে খুশি রাখার জন্য সবসময় চেষ্টা করবে। সবসময় তটস্থ থাকবে যাতে তার দ্বারা কোনো ভুল না হয়ে যায়। কারণ চাকরি চলে গেলে সে কোথা থেকে ব্যাংকের কিস্তির টাকা পরিশোধ করবে? তো সে মানুষটা নিজে থেকেই এই সমস্যা তৈরি করেছে। তার যে নিজের গাড়ি নেই, সেটা নিয়ে তো

কেউ তাকে বিদ্রুপ করেনি। কিন্তু সে নিজেই এই স্ট্যান্ডার্ড তৈরি করেছে এবং সোনার খাঁচায় নিজেকে আটকে ফেলেছে। সে মানুষকে দেখানোর জন্যই তার জীবন কাটাচ্ছে।

আবার ধরুন আপনি কাউকে পছন্দ করে ফেলেছেন। বিশেষ করে তরুণরা একে অপরের সাথে অনেক তুলনা করে এবং এই কারণেই তারা নিজেকে নিজে হারিয়ে ফেলেছে।

২) ভুল প্রত্যাশা করা

মানুষ দুনিয়াবী জিনিসের উপরে অনেক আশা নিয়ে বসে থাকে। দুনিয়াবী জিনিসের উপর আপনার যতই আশা থাকবে, ততই দুঃখ আসবে। এ পৃথিবীতে মুসাফিরের মতোই থাকুন। মুসাফির যেমন অল্প কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে তারপর আবার তার গন্তব্যে ছুটে চলে, ঠিক সেভাবেই। যতই আপনি এখানে মন বসাবেন, যতই দুনিয়াবী জিনিসগুলোর প্রতি আকর্ষিত হবেন, ততই আপনার চাওয়া, প্রত্যাশা বাড়তে থাকবে। প্রত্যাশা যত বাড়বে, ততই বাড়বে দুঃখ পাওয়ার সুযোগ।

৩) বিপরীত ধ্যান-ধারণার মানুষের সাথে থাকা

আমরা অনেকেই ঐসব লোকদের সংস্পর্শে থাকি, যাদের মূল্যবোধ আমাদের চেয়ে একেবারে বিপরীত। একই বাইকের দুই টায়ারের সাইজ দুই রকমের হলে সেই বাইক ঠিকমতো চলবে না, এটাই স্বাভাবিক। তাহলে বিপরীত আইডিয়া ও ধ্যান-ধারণার দুইজন মানুষ একসাথে চলা কীভাবে সম্ভব, যদি না তাদের মধ্যে কোনো কম্প্রোমাইজ করা হয়? বিপরীত মূল্যবোধের মানুষের সাথে এক সাথে থাকলে অবশ্যই নিজের আচার আচরণ ও চিন্তা ভাবনায় তা প্রভাব ফেলে। ঠিক এই কারণেই মানুষ অনেক দুঃখী থাকে।

৪) ভুল সিদ্ধান্ত নেয়া এবং নিজেকে দোষারোপ করা

প্রত্যেক মানুষই জীবনে সিদ্ধান্ত নেয়। কখনো সঠিক, কখনো হয়তো ভুল। ভুল সিদ্ধান্ত মানুষের জীবনের একটা অংশ। কিন্তু অনেকেই এই ভুল সিদ্ধান্তের জন্য কান্নাকাটি করে এবং নিজেকে দোষারোপ করতে থাকে। এটা তার self-esteem

নষ্ট করে এবং সেটা তার বডি ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে আপনি সহজেই বুঝতে পারবেন। সে নিজেকে নিজে দোষারোপ করে নিজেরই ক্ষতি করে আর এটা শয়তানের পক্ষ থেকেই আসে। নিজেকে দোষ না দিলেও বাবা-মাকে দোষারোপ করে। তাও না পারলে অমুককে দোষ দেয়, তমুককে দেয়। ভাবতে থাকে "ইশ্! এটা করলে ঐরকম হতো।" আর যখন তার মধ্যে এসব কিছু চলতে থাকে, তখন সে মানুষটা ভেতরে ভেতরে অনেক দুঃখী হয়।

৫) আমাদের লাইফস্টাইল ও ইসলামিক জীবনদর্শনের মধ্যে দ্বন্দ্ব

যদি আপনি এই বিষয়টি বোঝেন, তাহলে আপনার জীবনের আশি থেকে নব্বই ভাগ সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। এখনকার সময়ের মানুষদের ভাবনা এবং তাদের লাইফস্টাইলের সাথে ইসলামিক দর্শনের অনেক পার্থক্য আছে। কীভাবে?

ইসলাম দুনিয়ার ব্যাপারে কী বলে? তাদাব্বুর সহ কুরআন পড়লে বুঝতে পারবেন। এটাই সেই দুনিয়া, যার জন্য আমরা দিন-রাত পরিশ্রম করছি। যেসব দুনিয়াবী বিষয় নিয়ে আমরা রাত দিন টেনশন করছি, না জানি এগুলো সাহাবীদের জীবনে কোথায় ছিল! আল্লাহ আমাদেরকে যা দিয়েছেন, সেটাই আমাদের জন্য যথেষ্ট। যদি এর চেয়ে বেশি পেতাম, তাহলে হয়তো অহংকারী হয়ে যেতাম। আল্লাহ তা'আলা আমাদের যা দিয়েছেন, সেটাই আমাদের জন্য উত্তম। কিন্তু তার মানে এই না যে, মানুষ চেষ্টা করবে না। কিন্তু আমাদের সমস্যা হচ্ছে আমরা চারপাশের সবকিছুই দুনিয়াবী প্যারামিটারেই বিচার করে থাকি। যেমন ধরুন, সাধারণত আজকালকার বাবা-মায়েরা সন্তানের জন্য কি দোয়া করে? সে যেন ভালো জায়গায় চাকরি করে বা ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার হয়। কিন্তু সে যদি তা করতে ব্যর্থ হয়, তখন আমরা বলি এটা তার দুর্ভাগ্য।

দুনিয়াতে আমরা সবাই কম বেশি রিজিক পাব এবং কাফেররাও দুনিয়া পাবে। কিন্তু আসল জিনিস হচ্ছে হিদায়াত। তাই সাহাবীরা সব সময় হিদায়াতের জন্য দোয়া করতেন। দুঃখের ব্যাপার হচ্ছে আমরা ভুল মূল্যবোধের পিছনে ছুটে বস্তুবাদী জিনিসের প্রতি এমন আসক্ত হয়ে গেছি যে এখন ঐসব কথাবার্তা আমাদের বিরক্ত করে, যেগুলো আমাদের মূল্যবোধের বিরোধী। দুনিয়াকে যেহেতু মাথার উপর উঠিয়ে নিয়েছি, তাই দুনিয়া এখন মাথার উপর উঠে নাচছে। কিন্তু লোনা পানির মতো এটা আমাদের তেষ্টা মেটায় না। তাই ইসলামের স্বাদু পানির অভাবে আমাদের দুঃখ রয়েই যায়।

ফিলোসোফি অফ স্যাডনেস

কুরআন অনুযায়ী দুঃখের ফালসাফা কী? দুঃখ কেন আসে? আমাদের জীবনে দুঃখের কেন প্রয়োজন? আল্লাহ তা'আলা ওহুদ যুদ্ধের পরে সূরাহ আলে ইমরানের ১৫৩ নাম্বার আয়াতে বলেন,

إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ
فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِّكَيْلَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ ۗ وَاللَّهُ
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

"অতঃপর তোমাদের উপর এলো শোকের ওপরে শোক, যাতে তোমরা হাত থেকে বেরিয়ে যাওয়া বস্তুর জন্য দুঃখ না কর এবং যার সম্মুখীন হচ্ছ সেজন্য দুঃখিত না হও। আর আল্লাহ তোমাদের কাজের ব্যাপারে অবহিত রয়েছেন।"

ওহুদ যুদ্ধে সাহাবীদের অন্তরে কী কী দুঃখ এসেছিল? পরাজয় ও ব্যর্থতার দুঃখ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অমান্য করার দুঃখ, তাঁকে আহত হতে দেখার দুঃখ, নবীজির দন্ত মোবারক শহীদ হওয়ার দুঃখ, নবীজির প্রিয় চাচা হামজা রাদিয়াল্লাহু আনহু শহীদ হওয়ার দুঃখ, সত্তর থেকে আশি জন সাহাবী শহীদ হওয়ার দুঃখ। মোটকথা বলা যায় দুঃখের পরে দুঃখ।

এই দুঃখের উপর দুঃখ আপতিত হওয়ার কারণ হলো, যাতে তাদের মধ্যে দুঃখ-কষ্ট সহ্য করার শক্তি এবং দৃঢ়সংকল্প ও উৎসাহ সৃষ্টি হয়। মানুষের উপর যখন একটা বিপদ আসে, তখন সে ঘাবড়ে যায়। দ্বিতীয় বিপদ এলেও ঘাবড়ে যায়। তারপর তৃতীয়টা যখন আসে, তখন সে নিজেকে শক্ত করে নেয় এবং সেটার মোকাবেলা করতে পারে সহজে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এখানেই দুঃখের ফিলোসোফি বর্ণনা করেছেন। জীবনে দুঃখ পাওয়ার দরকার আছে। যদি আপনি দুঃখই না পেতেন, তাহলে কীভাবে আল্লাহর শোকর আদায় করতেন? কীভাবে আল্লাহর নেক বান্দা হতে পারতেন? কীভাবে মানুষের দুঃখ বুঝতেন? যেহেতু সাহাবীদের দুনিয়াতে এক নতুন বিপ্লব আনতে হতো, তাই দুঃখ শোকও তাদের জন্য দরকারি ছিল। এজন্য দুঃখকে নতুন একটা সুযোগ হিসেবে দেখা উচিত। কারণ দুঃখ আসবে এবং অবশ্যই আসবে, যার ফলে আস্তে আস্তে আপনি দুঃখ করাই ছেড়ে দেবেন। যাতে আপনি বুঝতে পারেন এটাই হচ্ছে আসল জীবন। মানুষের জীবনে দুঃখ আসে, যাতে সে তার জীবনের উদ্দেশ্য খুঁজে পায়।

যে কোনো উদ্দেশ্য ছাড়াই জীবন পার করছে, তাকে দুঃখ সহজেই আঘাত করবে। কাফিররা এমনি এমনি সুইসাইড করে না। তাদের জীবনেও দুঃখ আসে। দুঃখের পরে দুঃখ আসে। কিন্তু তখন তারা কোনো উদ্দেশ্য খুঁজে পায়না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কয়েক বছরের মধ্যে আবু তালিব এবং বিবি খাদিজার মৃত্যু দেখেছিলেন। এরকম দুঃখ সহ্য করা যেকোনো সাধারণ মানুষের জন্য অনেক কঠিন। অধিকাংশ লোকই এখানে হাল ছেড়ে দিত এবং এতটাই হতাশায় ডুবে যেত যে, দৈনন্দিন কাজ ঠিকমতো করতে পারত না। কিন্তু ওনার জানা ছিল জীবনের উদ্দেশ্য কী। সেই উদ্দেশ্য তাঁকে সামনে এগিয়ে যাওয়ার, দুঃখ সহ্য করার শক্তি যুগিয়েছে। কিন্তু শয়তান মুসলিমদের থেকে সেই উদ্দেশ্য কেড়ে নিয়েছে। যখন কারো জীবনে বড় কোনো ক্ষতি হয়ে যায়, তখন সে ভাবে তার জীবনটাই শেষ হয়ে গেল। তাই জীবনের উদ্দেশ্য থাকাটা অনেক দরকার। দুঃখ সহ্য করার জন্য উদ্দেশ্য থাকা দরকার। ইসলাম যেভাবে জীবনের উদ্দেশ্য দিয়েছে, আখিরাতের বা জান্নাতের ধারণা দিয়েছে, সকল দুঃখ সহ্য করার জন্য সেটাই যথেষ্ট।

কুরআন অনুযায়ী দুঃখবোধের ধরন

যেহেতু আল্লাহ আমাদের সৃষ্টি করেছেন, তাই একমাত্র তিনিই মানুষের সাইকোলজি সম্পর্কে সবচেয়ে ভালো জানেন। তাই আল্লাহ দুঃখবোধের বিভিন্ন অবস্থা কুরআনে বর্ণনা করেছেন।

আল-গাম

আল-গাম শব্দটি আল গামাম থেকে এসেছে। এটি আকাশের একটি অবস্থা। যখন ঘন মেঘের কারণে একটি ক্ষুদ্র সূর্যরশ্মিও এর মধ্যে দিয়ে আসতে পারে না, সেটাই আল-গামাম। এটা হচ্ছে দুঃখের ঐ অবস্থা, যখন কোনো খারাপ ঘটনা আপনার সাথে এখনো ঘটেনি, কিন্তু আপনি মনে মনে সেটার প্রত্যাশা করছেন। এটা হচ্ছে নেগেটিভিটির চূড়ান্ত অবস্থা। এখনো সে দুর্ঘটনা ঘটবে কি ঘটবে না, তা আপনি জানেনও না। কিন্তু চিন্তা করতে করতে নিজেকে নিজে ধ্বংস করছেন। যেমনটা কুরআনে ইউনুস আলাইহিস সালামের ব্যাপারে বলা হয়েছে:

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ ۚ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ

"অতঃপর আমি তাঁর আহবানে সাড়া দিলাম এবং তাঁকে দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দিলাম। আমি এমনি ভাবে বিশ্বাসীদের মুক্তি দিয়ে থাকি।" (সূরাহ আম্বিয়া, ২১:৮৮)

ইউনুস আলাইহিস সালাম মাছের পেটে অন্ধকারে দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়ছিলেন। এক ধরনের দুশ্চিন্তা তাঁকে গ্রাস করছিলো ধীরে ধীরে। আর তখনি তাঁর দোয়ার জবাব হিসেবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'লা উনাকে দুঃশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দিলেন।

আল-হুযুন

এই ধরনের হতাশা আসে দুর্ঘটনার পরপরই। যেমন আপনি কোনো চাকরি খুঁজছেন, কিন্তু মনমতো পাচ্ছেন না। অথবা এক কৃষক অনেক আশায় আছে যে ভালো ফসল হবে। কিন্তু ঝড় এসে তার সকল পরিশ্রম নষ্ট করে দেয়। এইরকম দুর্ঘটনার পরে যে অনুভূতি আসে, সেটাই হচ্ছে আল-হুযুন।

فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

"অতঃপর যদি তোমাদের নিকট আমার পক্ষ থেকে কোনো হিদায়াত পৌঁছে, তবে যে ব্যক্তি আমার সে হিদায়াত অনুসারে চলবে, তার উপর না কোনো ভয় আসবে, না (কোনো কারণে) তারা চিন্তাগ্রস্ত ও সন্তপ্ত হবে।" (সূরাহ বাকারা, ২:৩৮)

এই আয়াতের শিক্ষা হচ্ছে দুনিয়াতে দুঃখ-দুর্দশা আসবেই। কিন্তু সেই দুঃখ দুর্দশা আখিরাতের শাস্তির চেয়ে কিছুই না।

আল-ওয়াইল

এটি হচ্ছে নিজেকে অভিশপ্ত মনে করার অনুভূতি। মানুষ মনে করে তার ভাগ্যটাই খারাপ, তার দ্বারা ভালো কিছু হবে না। এটা আসলে শয়তানের পক্ষ থেকেই আসে। শয়তান আপনার ভেতরে এই অনুভূতি জাগিয়ে দিয়েছে যে, আল্লাহ বুঝি

আপনাকে ভুলে গেছেন। এটাই হচ্ছে দুঃখবোধের চূড়ান্ত রূপ, যা ডিপ্রেশন ও সুইসাইডের দিকে নিয়ে যায়। মানুষের ভেতরে কোনো কনফিডেন্স থাকে না। "আমি যা-ই করি না কেন, ব্যর্থ হয়ে যাই। তাহলে আমার আর বেঁচে থেকে কী লাভ আছে?"

আল-বাস

যে দুঃখটা অন্যের কাছে ব্যাখ্যা করে বোঝানো যায় না, সেটাই আল-বাস। আপনারা হয়তো দেখে থাকবেন কিছু মানুষকে দুঃখিত দেখে যদি তাদের জিজ্ঞেস করেন কী হয়েছে, তারা কিছুই বলতে পারে না এবং কাঁদতে শুরু করে। কারণ তারা আসলে জানেই না যে, বিষয়টাকে কীভাবে ব্যাখ্যা করবে। এতো কিছু হয়ে গেছে যে, বুঝতে পারে না সমস্যা কী!

ইয়াকুব আলাইহিস সালাম এমন দুঃখে কাঁদতে কাঁদতে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। আমরা তো আর যা-ই হোক, কাঁদতে কাঁদতে অন্ধ হই না। কিন্তু তার পরেও তিনি আল্লাহর ব্যাপারে নেগেটিভ কিছু বলেননি। এটাই তাঁর চরিত্রের দৃঢ়তা। তিনি সে দুঃখ সহ্য করেছেন।

قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

> "তিনি বললেন, আমি তো আমার দুঃখ ও অস্থিরতা আল্লাহর সমীপেই নিবেদন করছি এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে আমি যা জানি, তা তোমরা জানো না।" (সূরাহ ইউসুফ, ১২:৮৬)

ঠিক একই ব্যাপার আইয়ুব আলাইহিস সালাম এর ক্ষেত্রে হয়েছিল। তিনিও কখনও আল্লাহর কাছে অকৃতজ্ঞতা দেখাননি।

আল-আসাফ

দুঃখ যখন রাগে রূপ নেয়, প্রতিশোধস্পৃহায় মানুষ দানব হয়ে যায়, সেটাই আল-আসাফ। যেমন আপনি পরীক্ষায় খারাপ রেজাল্ট করেছেন। এখন সেই দুঃখে আপনি আপনার বন্ধু-বান্ধব ও পরিবারের সদস্যদের সাথে খারাপ ব্যবহার করেন। যেমনটা মুসা আলাইহিস সালাম তাঁর ভাই হারুনের উপর দেখিয়েছিলেন।

وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي ۖ أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ ۖ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ ۚ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

"তারপর যখন মূসা নিজ সম্প্রদায়ে ফিরে এলেন রাগান্বিত ও অনুতপ্ত অবস্থায়, তখন বললেন, 'আমার অনুপস্থিতিতে তোমরা আমার কি নিকৃষ্ট প্রতিনিধিত্বটাই না করেছ। তোমরা নিজ পরওয়ারদেগারের হুকুম থেকে কি তাড়াহুড়া করে ফেললে?' তিনি তখতীগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিলেন এবং নিজের ভাইয়ের মাথার চুল চেপে ধরে নিজের দিকে টানতে লাগলেন। ভাই বললেন, 'হে আমার মায়ের পুত্র, লোকগুলো যে আমাকে দুর্বল মনে করল এবং আমাকে যে মেরে ফেলার উপক্রম করেছিল। সুতরাং আমার উপর আর শত্রুদের হাসিও না। আর আমাকে জালিমদের সারিতে গণ্য করো না।'" (সূরাহ আরাফ, ৭:১৫০)

সমাধান

১) কুরআন অনুযায়ী দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করা

দুঃখকে মোকাবেলা করার সবচেয়ে ভালো উপায় হচ্ছে নিজের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করা। আর তা হবে কুরআনের মাধ্যমে। হাদিসে এসেছে, এক সাহাবি রাসূল সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন, "হে আল্লাহর রাসূল, দুনিয়াতে সবচেয়ে বুদ্ধিমান ব্যক্তি কারা?" তিনি জবাব দিলেন, "যারা মৃত্যুর কথা অধিক পরিমাণে স্মরণ করে এবং তার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে। দুনিয়া-আখেরাতে তারাই সম্মান ও মর্যাদার মুকুট পরিহিত হবে।"[১৪]

এ বিষয়টা যে বুঝতে পেরেছে সে জানে এই দুনিয়াটা আসলে কিছুই না। আল্লাহ তা'আলার সামনে দুনিয়ার মূল্য মশার পাখনার সমানও নয়। যদি তাই হতো, তাহলে আল্লাহ তা'আলা কাফেরদেরকে কিছুই দিতেন না। তাই কুরআন দিয়ে আপনার দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করুন। এটা তখনই হবে, যখন আপনি নিয়মিত

---

[১৪] মুজামুল কাবির: ১৩৫৩৬

কুরআন পড়বেন বা কুরআনের সাথে লেগে থাকবেন এবং কুরআনকে অর্থসহ জানবেন। যদি আপনি কুরআনের অর্থসহ পড়েন, তাহলে এটা হতে পারে না যে কুরআন আপনার মাইন্ডসেট পরিবর্তন করবে না। সমস্যাগুলোকে তখন ছোট বলে মনে হবে।

২) কনফ্লিক্টগুলো সমাধান করা

ঐসব কনফ্লিক্টগুলোকে সমাধান করার চেষ্টা করুন, যেগুলোর সমাধান করা যায়। একেবারে হাত গুটিয়ে বসে থাকবেন না। ধরুন আপনার দাম্পত্যসমস্যা হচ্ছে। তো এখানে দুইটা সমাধান আছে। হয় বিচ্ছেদ, নাহয় ধৈর্য ধারণ করে বিয়েটা টিকিয়ে রাখা। এটি বাদে তৃতীয় কোনো সমাধান নেই। এখন আপনিই দেখে নিন আপনি কী করতে পারেন। সংসার করতে না চাইলে আপনাকে তো কেউ জোর করবে না। বিচ্ছেদ ঘটান। আর যদি সংসার করতে চান, তাহলে প্রতিদিন কান্নাকাটি করা বন্ধ করুন। ধৈর্য ধারণ করুন। আল্লাহর কাছে দোয়া করুন। ম্যানেজ করার চেষ্টা করুন। কারণ বিয়ে মানেই হচ্ছে সম্পর্ক ম্যানেজ করা। তাই দুঃখের মধ্যে থেকে থেকে নিজেকে ধ্বংস না করে সমাধানের চেষ্টা করুন।

৩) তাকদিরে বিশ্বাস করা

এটা আপনাকে আফসোস ও অনুতাপ থেকে বাঁচিয়ে দেবে। আপনি কোনো কিছু পাওয়ার জন্য অনেক পরিশ্রম করেছেন। কিন্তু আপনি সেটা পাননি। তখন বলুন "আলহামদুলিল্লাহ"। আপনার দায়িত্ব ছিল চেষ্টা করা, সেটা আপনি করেছেন। তারপরও পাননি, কারণ এটাই আল্লাহ তা'আলার সিদ্ধান্ত। ব্যাস এতটুকুই। আরেকজনের সাথে নিজেকে তুলনা করবেন না এবং নিজের কাছে যা আছে, সেটা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকুন।

৪) সবকিছু পজিটিভ দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখা

জীবনের সবকিছুই পজিটিভ দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখার কৌশল শিখে নিন। সকল ঘটনাকেই ইতিবাচকভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। কারো যদি অনেক বড় ক্ষতি হয়ে যায়, মানুষ তো এটাই ধরে নেয় যে আল্লাহ তা'আলা তাকে অনেক বড় শাস্তি দিয়েছেন।

কিন্তু এটার পজিটিভ ইন্টারপ্রিটেশন এমন হতে পারে যে, আল্লাহ তা'আলা চান না দুনিয়ার সাথে তার অন্তর লেগে থাকুক। এজন্য হয়তো আল্লাহ তা'আলা ক্ষতির পরে ক্ষতি দিচ্ছেন। হয়তো আল্লাহ তা'আলা তার দ্বারা বড় কোনো কাজ করিয়ে নেবেন। আল্লাহ তা'আলা এটাই চান যে দুনিয়াতে যেন আমার ক্ষতি হয়, যাতে আমি এই দুনিয়ার টেনশনই ছেড়ে দিই। হয়তোবা এর বিনিময়ে জান্নাতে অনেক বড় নিয়ামত দান করবেন। এখন এটা আপনার উপরে নির্ভর করে আপনি কীভাবে ইন্টারপ্রেট করবেন।

৫) দোয়া করা

দুঃখের সময় একেবারে অন্তরের ভেতর থেকে দোয়া বের হয়ে আসে। মানুষ যখন কোন কারনে দুঃখ ভারাক্রান্ত থাকে, তখনই সে আল্লাহর কাছে দোয়া করে। তাই আল্লাহ তা'আলার সাথে নিজের দুঃখগুলো শেয়ার করুন, যাতে আল্লাহ আপনাকে দুঃখ থেকে বের হওয়ার তৌফিক দেন।

৬) জীবনের উদ্দেশ্য খুঁজে নেয়া

যতক্ষণ পর্যন্ত আপনার উদ্দেশ্য থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আপনার জীবনে চলাটা সহজ হবে। আর মুসলিমদের তো জীবনের উদ্দেশ্য জানাই আছে। মানুষের বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত থাকা উচিত। এতে তার উদ্দেশ্য তৈরি হবে। আর ইসলাম আমাদের যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য দেয়, সেটাই সর্বোত্তম। ইসলাম আমাদের ধারণা দেয় কীভাবে আমরা এই দুনিয়াতে চলব। যখন আমরা দুনিয়ার হাকিকত, তাকদির, আখিরাত ও আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে জানব, আমাদের সকল দুঃখ আপনা আপনি দূর হয়ে যাবে। সম্ভব হলে নিজেকে বিভিন্ন চ্যারিটি ও সেবামূলক কাজে ব্যস্ত রাখুন। পশ্চিমা দেশগুলোর অনেকে ডিপ্রেসড মানুষ নিজেকে রিলিফ ওয়ার্ক ও চ্যারিটিতে ব্যস্ত রাখে, যাতে করে তারা ভিতর থেকে শান্তি পায় এবং তাদের দুঃখবোধ থেকে বের হয়ে আসতে পারে। তাই জীবনের উদ্দেশ্যের সাথে নিজেকে জড়িত রাখা জরুরী।

হুট করে কেন মন খারাপ হয়?

অনেক সময় দেখা যায়, কোনো কারণ ছাড়াই হুট করে আমাদের মন খারাপ হয়ে যায়। বুকের বাম পাশটা ভারী অনুভূত হয়। মনটা হঠাৎ করে বিষণ্ন হয়ে পড়ে। এই হঠাৎ করে বিষাদগ্রস্ত হয়ে যাওয়াকে সাইকোলজির ভাষায় বলে Melancholy।

এই বিষয়টাকে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ব্যাখ্যা করা যাক। এই হঠাৎ করে মন খারাপ হওয়া, অন্তরে শূন্যতা অনুভব করা—এটা আত্মা বা রূহের চিৎকার। আপনার রূহ কোনো কিছুর অভাবে কান্না করছে। সে হয়তো তার খাবার পাচ্ছে না বা হয়তো রূহ দুর্বল হয়ে গেছে।

মানুষের দুঃখের সাথে তার রূহের গভীর সম্পর্ক আছে। আপনার রূহ যখন শক্তিশালী হবে না, তখন আপনার মধ্যে এসব লক্ষণ দেখা দিবে। তখন হুট করে আপনার মন খারাপ হয়ে যায়। পরে দেখা যায় আপনি কোনো কারণ ছাড়াই হতাশায় ডুবে যান এবং হঠাৎ করেই আপনার অতীতের কোনো ঘটনা মনে পড়ে। কারো কারো ক্ষেত্রে পুরনো প্রেমের কথা মনে পড়ে যায়।

তবে এ ধরনের সমস্যায় পড়লে কেউ কেউ আবার গান শুনতে থাকে। গান শুনলে হয়তো আমাদের মনকে কিছু সময়ের জন্য বিক্ষিপ্ত করে দেয়া যায়। তবে এটা কোনো স্থায়ী সমাধান না।

এখন এটার সমাধান দুইভাবে দেওয়া যায়। একটা হচ্ছে, যদি এটা সাইকোলজিক্যাল ডিসঅর্ডার হয় তাহলে সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে যেতে পারেন। আর সাইকিয়াট্রিস্ট ভালোভাবে নির্ণয় করে দেখবেন এটি সাইকোলজিক্যাল ডিসঅর্ডার কি না। তারপর সে অনুযায়ী সঠিক চিকিৎসা দিবেন। আর দ্বিতীয়

সমাধানের ব্যাপারে আপনাকে প্রথমে বুঝতে হবে রূহের দুর্বলতা এবং শয়তানের ওয়াসওয়াসা। আল্লাহ তা'আলা মানুষের রূহে তিন ধরনের নফস রেখেছেন। নফসে লাওয়ামা, নফসে আম্মারা ও নফসে মুতমাইন্না।

নফসে লাউওয়ামা হলো অনুতপ্ত সত্তা। সে নফসের তাড়নায়, শয়তানের ধোঁকায় বা পারিপার্শ্বিক পরিবেশ ও পরিস্থিতির শিকার হয়ে পাপ করে এবং পরে লজ্জিত, অনুতপ্ত হয়ে তওবা করে।

নফসে আম্মারা হলো পাপের প্রতি আকৃষ্ট নফস বা অবাধ্য সত্তা।

নফসে মুতমাইন্না মানে হলো প্রশান্ত নফস, যার পাপের প্রতি অনুরাগ থাকে না এবং নেকির প্রতি আকর্ষণ থাকে।

যখন নফসে লাউওয়ামা এবং নফসে মুতমাইন্না মানুষের মধ্যে গড়ে উঠে না, তখন নফসে আম্মারা সহজেই প্রভাব বিস্তার করে। যখনই বাকি দুই নফসের চেয়ে নফসে আম্মারার প্রভাব বেশি হবে, তখনই শয়তানের আক্রমণ করা সহজ হয়ে যায়। ইমাম ইবনুল কাইয়িমের ভাষ্যমতে, একজন হতাশ ঈমানদারই শয়তানের সবচেয়ে প্রিয় পাত্র। যখন শয়তান আপনাকে হতাশ অবস্থায় পাবে, তখন সে সহজেই এর সুযোগ নিবে।

তো এখন এই অবস্থা থেকে মুক্তির উপায় কী? তা হচ্ছে বাকি দুই নফসকে শক্তিশালী করা এবং রূহকে মজবুত করা।

কীভাবে শক্তিশালী করব? এমন কাজে ব্যস্ত থাকতে হবে, যাতে আমাদের রূহ খুশি থাকে। প্রবৃত্তি না কিন্তু, রূহ। যেমন বিভিন্ন চ্যারিটি ওয়ার্ক, সোশ্যাল ওয়ার্ক বা কমিউনিটি সার্ভিস, হাসপাতালে কাউকে দেখতে যাওয়া ইত্যাদি।

আরেকটা হচ্ছে নিয়মিত শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করা। নিয়মিত জিকির-আজকার, তাসবিহ পড়া। যেমন লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহ, সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি, দুরুদ শরীফ এগুলো নিয়মিত পড়তে পারেন। আল্লাহ তা'আলা কুরআনে বলেছেন:

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

"যারা ঈমান গ্রহণ করেছে, আল্লাহর জিকির দ্বারা তাদের অন্তর শান্ত হয়। জেনে রাখো! আল্লাহর জিকিরের দ্বারাই তারা অন্তরে শান্তি লাভ করে।" (সূরাহ রা'দ, ১৩:২৮)

ইসলাম আসলে পরিপূর্ণ একটি প্যাকেজ। ইসলামে যেমন শরীর, মনের কথা বলা হয়েছে, তেমনি রূহ বা আত্মার কথাও বলা হয়েছে। পশ্চিমা সাইকোলজিস্ট বা দার্শনিকদের কাছে আপনি শুধু শরীর ও মনের ব্যাপারে বিশদ ব্যাখ্যা পাবেন। সেখানে তারা মন নিয়ে কথাবার্তা বলেছে বেশি। ইসলামে যেমন জিকির-আজকার আছে, নামাজ আছে, ধৈর্যও ধরতে বলা হয়েছে; আবার রূহের খাবারের কথাও বলা হয়েছে। যখন আমরা এসবের উপরে আমল করতে পারবো, ইনশাআল্লাহ অবশ্যই আমরা এই অবস্থা থেকে বের হয়ে আসতে পারবো। তাই এই জিনিসগুলো আপনি যত তাড়াতাড়ি বুঝবেন, ততই আপনার জন্য ভালো। যদি না বোঝেন তাহলে এই অবস্থার মধ্যেই আপনি আটকে থাকবেন।

কিছু পাওয়ার জন্য অবশ্যই আপনাকে কিছু কষ্ট স্বীকার করতে হবে এবং পদক্ষেপ নিতে হবে। আমরা আশেপাশের সবাইকে বলি আমার এই এই সমস্যা, কিন্তু এর জন্য আমরা কোনো পদক্ষেপ নিই না। এভাবে আসলে সমস্যার সমাধান হয় না। অবশ্যই আমাদেরকে কার্যকরী পদক্ষেপ নিতে হবে। আপনি দুই-একবার পদক্ষেপ নিয়ে দেখেন, আল্লাহ তাআলা অবশ্যই বরকত দিবেন। এর পাশাপাশি আল্লাহর কাছে দোয়াও করুন।

আপনার শত্রুকে চিনুন

যদি দ্বীন ইসলামকে ভালোভাবে খেয়াল করেন, তাহলে দেখবেন আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ছাড়া আর কেউই আমাদের প্রতি এতটা আন্তরিক না। তাঁরা যে সংবাদ আমাদের দিয়েছেন, যে কথাগুলো আমাদের বলেছেন, যে বিষয়গুলো নিয়ে আমাদের সতর্ক করেছেন, এটা প্রকৃতপক্ষে আমাদের প্রতি তাঁদের ভালোবাসার একটি নিদর্শন। যেন আমরা ধ্বংসের হাত থেকে বেঁচে যাই। দুনিয়াটা মজা করার জায়গা না। হ্যাঁ, এটা অস্বীকার করার উপায় নেই এ দুনিয়াতে অনেক সৌন্দর্য আছে। অনেক মাখলুকাতকে আমাদের অধীন করে দেয়া হয়েছে। এই দুনিয়ার জিম্মাদারী আমাদের প্রতি দেয়া হয়েছে। এখন দেখার বিষয় আমরা সেটা কতটুকু দায়িত্বের সাথে পালন করতে পারি। কিন্তু এই দুনিয়া আমাদের জন্য আরাম-আয়েশের জায়গা নয়। কারণ এখানে অনেক হুমকি আছে। যেমন রোগ-ব্যাধি, ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া। যদি আপনি সাবধানে না চলেন, তাহলে রোগে আক্রান্ত হবেন সহজেই। আমাদের এখানে ঠান্ডা লাগে, গরম লাগে। আমাদের জ্বর চলে আসে। আরো বিভিন্ন রকমের হুমকি আছে আমাদের উপর।

আপনাকে যে উদ্দেশ্যে পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছিল, সেটা নস্যাৎ করার জন্যও আছে কিছু হুমকি ও শত্রু। যুদ্ধক্ষেত্রে গেলে অবশ্যই শত্রু সম্পর্কে জানতে হয়, যাতে সেভাবে প্রস্তুতি নেওয়া যায়। আল্লাহ তাআলা কুরআনে মানবজাতির সবচেয়ে বড় শত্রুর ব্যাপারে পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছেন। সে মানুষকে ধোঁকা দেয়, মিথ্যা ওয়াদা দেয়, মানুষকে সবদিক থেকে হামলা করে। তার একটাই উদ্দেশ্য: মানুষের বিরুদ্ধে বদলা নেওয়া। আপনাদের সামনে হয়তো পরিষ্কার হয়ে গেছে আমি কী নিয়ে কথা বলছি। হ্যাঁ, সে শত্রু হচ্ছে শয়তান।

শয়তান থেকে নিজেকে হিফাজত করতে আমরা "আউজুবিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম" পড়ি। এর দ্বারা আমরা আল্লাহর কাছে শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি। কারণ কুরআন পড়লে বুঝতে পারবেন সে মানুষকে কতটা ঘৃণা করে।

قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ

"সে বললঃ আপনি আমাকে যেমন উদভ্রান্ত করেছেন, আমিও অবশ্যই তাদের জন্যে আপনার সরল পথে বসে থাকবো।" (সূরাহ আ'রাফ, ৭:১৬)

শয়তান মনে করে আল্লাহই তাকে ভুল পথে পরিচালিত করেছেন (নাউজুবিল্লাহ)। আদম আলাইহিস সালামকে খলিফা করা হয়েছিল। আর শয়তান সেটা সহ্য করতে পারেনি। আর এই হিংসার কারণে সে কুরআনে যে কথাগুলো বলেছে, সেগুলো ভালো করে খেয়াল করলে বুঝতে পারবো আমাদের জীবনে আসলে কী চলছে। আমরা জীবনভর অভিযোগ করতে থাকি, "অমুক হচ্ছে কেন?" "দুর্ঘটনা ঘটছে কেন?" কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তো বলেই দিয়েছেন এই দুনিয়ার জীবনটা একটা পরীক্ষা। আর কীভাবে আমাদের পরীক্ষা করা হবে, এটাও বলে দিয়েছেন।

كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

"আল্লাহ তোমাদেরকে যা কিছু দিয়েছেন, তা থেকে খাও এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।" (সূরাহ আনআম, ১৪২)

এই আয়াত থেকে একটা বিষয় পরিষ্কার যে শয়তান আমাদের প্রকাশ্য দুশমন। আর সে শয়তান আল্লাহ তাআলাকে বলেছিল "আমি আদম সন্তানকে বিপথে নিতে থাকবো।" হতে পারে সে কোনো দুঃখ-দুর্দশা দিয়ে বা কোনো গুনাহ করিয়ে আমাদের বিপথে নিবে, হতে পারে আমাদের ঈমানের কোনো ক্ষতি করে আমাদেরকে বিপথে নেবে। অথবা ইসলামের ব্যাপারে আমাদের মধ্যে সন্দেহ তৈরি করে। এরকম অনেকগুলো উপায় আছে, যেগুলো শয়তান বিপথে নেওয়ার জন্য আমাদের উপর ব্যবহার করে।

আপনি নিজেই একবার ভাবুন তার অভিজ্ঞতা কতটা বেশি। আদম আলাইহিস সালাম থেকে এ পর্যন্ত সে সকল মানুষকে দেখেছে। সকল নবীকে দেখেছে। সাহাবীদের দেখেছে। সভ্যতাকে গড়তে এবং ধ্বংস হতে দেখেছে। প্রজন্মের পর

প্রজন্ম ধরে সে লক্ষ লক্ষ নয়, কোটি কোটি মানুষকে গোমরাহি ও বিপথে নিয়েছে। অসংখ্য, অগণিত মানুষ তার ফাঁদে পা দিয়েছে। এ কথাটা আমি এই জন্য বলছি, কারণ এটা কোনো রূপকথা নয়।

এই শয়তান মানুষকে বিভিন্ন উপায়ে গোমরাহ করে থাকে। আলেমকে একভাবে গোমরাহ করে, কুরআনের হাফেজকে আরেকভাবে গোমরাহ করে, একজন সাধারণ মানুষকে গুনাহের পথে নিয়ে যেতে অন্য উপায় অবলম্বন করে। একজন হতাশ ও ডিমোটিভেটেড মানুষকে ভিন্ন উপায়ে আরো হতাশ করে, যাতে সে ইবাদাত না করতে পারে। তখন এমন হয় যে, আমাদের ইবাদাত করা কোনো মোটিভেশনই থাকে না। এভাবে নানা উপায়ে শয়তান আমাদের বিপথে নিয়ে যায়। এজন্যই আমরা শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই।

এই যুদ্ধ মৃত্যু পর্যন্ত চলবে। শয়তান মৃত্যু পর্যন্ত আমাদের ক্ষতি করার চেষ্টা করতেই থাকবে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা বলেছেন তাঁর অনুগত বান্দাদের শয়তান কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। তাই আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত আল্লাহর অনুগত ও শোকরগুজার বান্দা হওয়া।

শয়তান মানুষকে বিপথে নেয়ার জন্য আল্লাহকে চারটি ওয়াদা দিয়েছে। আমরা এক একটি ওয়াদা সম্পর্কে জানব। মানুষকে দুনিয়াতে পাঠানোর পর থেকে এই কাজগুলো করে যাচ্ছে এবং সে তাতে লেগেই আছে। অন্যদিকে আপনি কী করছেন? আপনি নিজেকে কতটা হেফাজত করছেন? দুনিয়াবী বিষয়ের হুমকি আছে বা ক্ষতির সম্ভাবনা আছে, এমন কিছুর ব্যাপারে আপনাকে বলা হলে আপনি সেটা থেকে বেঁচে থাকতে নানাভাবে চেষ্টা করেন। সে ব্যাপারে অভিজ্ঞদের পরামর্শ নেন। শারীরিক সমস্যার ক্ষেত্রে ডাক্তারের কাছে যান। মোটকথা আপনি সে ব্যাপারে যতভাবে পারা যায়, জ্ঞান অর্জন করার চেষ্টা করেন। কিন্তু যখন আল্লাহ বলছেন শয়তান আপনার সবচেয়ে বড় দুশমন এবং সে আপনাকে সঠিক পথ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চায়, আপনার প্রকৃত লক্ষ্য থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চায়, দুনিয়ার ভোগ বিলাসের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রেখে আখিরাতের ব্যাপারে বিমুখ করতে চায়, তখন আমাদের মধ্যে এতটুকু উপলব্ধি হয় না যে এটা আসলে কত গুরুত্বপূর্ণ একটি কথা।

ধোঁকায় পড়ে থাকা মানুষেরা বলে তাদের জীবনটা ধ্বংস হয়ে গেছে। কিন্তু এই ধ্বংস হওয়ার পিছনে যে সিদ্ধান্তগুলো ছিলো, আপনি কি সেগুলোর দিকে খেয়াল করেছেন? আপনি কি আল্লাহর কথা মেনেছিলেন, নাকি শয়তানের? শয়তান

মানুষকে কীভাবে বিপথগামী করে, সে ব্যাপারেও আল্লাহ তা'আলা আমাদের জানিয়েছেন।

وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ ۚ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا

"তাদেরকে পথভ্রষ্ট করব, তাদেরকে আশ্বাস দেব; তাদেরকে পশুদের কর্ণ ছেদন করতে বলব এবং তাদেরকে আল্লাহর সৃষ্ট আকৃতি পরিবর্তন করতে আদেশ দেব। যে কেউ আল্লাহকে ছেড়ে শয়তানকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, সে প্রকাশ্য ক্ষতিতে পতিত হয়।" (সূরাহ নিসা, ৪:১১৯)

ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَن شَمَائِلِهِمْ ۖ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ

"এরপর তাদের কাছে আসব তাদের সামনের দিক থেকে, পেছন দিক থেকে, ডান দিক থেকে এবং বাম দিক থেকে। আপনি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাবেন না।" (সূরাহ আ'রাফ, ৭:১৭)

এটাই হচ্ছে শয়তানের দাবি। এখন আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে আমরা শয়তানের এই দাবিগুলো মিথ্যা প্রমাণ করতে থাকবো। আমাদের আল্লাহ তা'আলার শোকর-গুজার হতে হবে এবং শয়তানের ধোঁকার মধ্যে পড়া যাবে না। শয়তান আমাদের বিভ্রান্ত করার জন্য সহজ-সরল পথের মধ্যে বসে থাকে। এখানে সহজ-সরল পথ মানে হচ্ছে ইসলামের রাস্তা। ঠিক সে রাস্তা, যেটা দুনিয়াতে শান্তি নিয়ে আসে। যেটা মানবজাতির জন্য সর্বোত্তম। যেটা অনুসরণ করে মানুষ সফল হতে পারে। কিন্তু শয়তান আমাদেরকে সফল হতে দিবে না। সব জায়গা থেকে আমাদের আক্রমণ করবে।

"তাদের কাছে আসব তাদের সামনের দিক থেকে" এর মানে হচ্ছে সে আমাদের অন্তরে আখিরাতের ব্যাপারে সন্দেহের উদ্রেক করাবে। কারণ আখিরাতই আমাদের ভবিষ্যৎ। শয়তান আমাদেরকে দুনিয়াতে এমনভাবে মগ্ন করে দিবে, যাতে আমরা আখিরাতকে ভুলে যাবো। ফলে মানুষ আখিরাতের জন্য কিছুই করবে না, সবকিছু দুনিয়ার জন্য করবে। পিছন থেকে আসবে এর মানে হচ্ছে দুনিয়ার শান-শওকত

এবং সম্পদ দেখাবে। যাতে মানুষ শুধু এই দুনিয়ার ব্যাপারেই আকাঙ্ক্ষা করে এবং আগ্রহ দেখায়।

তাদের ডানদিক থেকে আসবে, এর মানে হচ্ছে দ্বীন ইসলামের ব্যাপারে তাদের অন্তরে সন্দেহ সৃষ্টি করবে। ডান দিকের রাস্তা মানে হচ্ছে সঠিক রাস্তা। দ্বীন ইসলাম হচ্ছে একমাত্র সঠিক পথ। শয়তান আসলে কীভাবে শির্ক শুরু করেছে, জানেন? নুহ আলাইহিস সালাম এর সময় থেকে শির্ক শুরু হয়েছে। মানুষ আল্লাহ তা'আলার সাথে শরিক করতে শুরু করেছে। মূর্তি পূজা সেখান থেকে শুরু হয়েছে।

নুহ আলাইহিস সালাম এর সময়ে কিছু নেককার মানুষ খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করে। এক সময় তাঁরা মৃত্যুবরণ করলে শয়তান তাদের ভক্ত-অনুসারীদের প্ররোচনা দিল এই বলে যে, ঐসব নেককার লোকদের বসার স্থানে তোমরা তাদের মূর্তি স্থাপন কর এবং সেগুলিকে তাদের নামে নামকরণ কর। শয়তান তাদের যুক্তি দিল যে, যদি তোমরা মূর্তিগুলোকে সামনে রেখে ইবাদাত কর, তাহলে তাদের স্মরণ করে আল্লাহর ইবাদাতের প্রতি তোমাদের অধিক আগ্রহ সৃষ্টি হবে। তখন লোকেরা সেটা মেনে নিল। অতঃপর এই লোকেরা মৃত্যুবরণ করলে তাদের পরবর্তী বংশধরদের শয়তান কুমন্ত্রণা দিল এই বলে যে, তোমাদের বাপ-দাদারা এইসব মূর্তির পূজা করতেন এবং এদের অসীলায় বৃষ্টি প্রার্থনা করতেন ও তাতে বৃষ্টি হতো। এ কথা শুনে তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে সরাসরি মূর্তিপূজা শুরু করে দিল। এভাবেই মূর্তিপূজার সূচনা হয়। আর এখনকার সময়ে বিভিন্ন উপায়ে সে আমাদের ধর্মীয় জ্ঞানকে নষ্ট করার চেষ্টা করছে।

শয়তান নিশ্চয়ই এসব কাজ একলা করে না। সে তার দলকে সাথে নিয়ে এগুলো করে। জিন এবং মানুষের মধ্যে তার অনুগত লোক আছে। সে ও তার অনুগত দল মানুষকে গোমরাহ করার জন্য লেগেই আছে। সে মানুষকে ভালো থেকে দূরে সরিয়ে রাখে এবং খারাপকে কাছে নিয়ে আসে।

যখন পশ্চিমা দেশগুলোতে কিছুটা হলেও ক্রিশ্চিয়ানিটি ছিল, তখন তাদের মধ্যে অল্প হলেও নীতি-নৈতিকতা ছিল। ধর্ম হচ্ছে এমন একটা জিনিস, যেটা নীতি-নৈতিকতার অনুমোদন দেয় বা উৎসাহিত করে। আর আমরা মুসলমানরা ইসলামের অনুসারী যেটা আল্লাহ তা'আলার মনোনীত সঠিক দ্বীন। শয়তান আমাদেরকে আমাদের দ্বীনের ব্যাপারে সন্দেহবাতিকগ্রস্ত করে তোলে। ধর্মের

ব্যাপারে মানুষকে এমন একটা ধারণা দেয় যে, ধর্ম একটি পুরানো জিনিস এবং ধার্মিক মানুষেরা 'লুজার' প্রকৃতির মানুষ।

এভাবে সে মানুষকে গুনাহের পথে নিয়ে যায় এবং খারাপ কাজে উৎসাহিত করে। গুনাহকে সুন্দর করে দেখায়। বারসিসার গল্প হয়তো আমরা অনেকেই জানি। যখন আপনার গুনাহ করতে ইচ্ছা করবে তখন সে গল্পটি মনে রাখুন।

বনী ইসরাইলের সময় এক ছোট্ট গ্রামে বারসিসা নামে অত্যন্ত ধার্মিক এক ব্যক্তি ছিল। তাকে সন্ন্যাসী বলা যেতে পারে। সে আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস করত।

সেই গ্রামে তিন ভাই ও এক বোন থাকতো। সেই ভাইদের জিহাদের জন্য ডাকা হলো। কিন্তু তারা বোনকে একা রেখে যেতে চাইল না। কার কাছে রাখবে চিন্তা করতে লাগলো। গ্রামবাসীরা বলল বারসিসার কথা। কারণ গ্রামের সবাই বারসিসাকে উত্তম চরিত্রবান হিসাবে জানে। তো তারা বারসিসার কেছে গেল। অনুরোধ শুনে বারসিসা বলল, "আমি অভিশপ্ত শয়তানের কাছ থেকে পানাহ চাই।"

কারণ সে ভয় করছিল যে, সে গুনাহে লিপ্ত হয়ে যেতে পারে। তখন শয়তান বারসিসার মনে কুমন্ত্রণা (ওয়াসওয়াসা) দিতে আসল। চালাক শয়তান জানতো যে বারসিসার মন খুবই নরম। সে কানে কানে বারসিসাকে বলল - "তারা যদি ভালো কাউকে তাদের বোনের জন্য খুঁজে না পায় এবং খারাপ কারো কাছে মেয়েটিকে রেখে যায়, তখন কী হবে! এই পরিণতি কি তোমার ভুলের জন্য নয়?"

বারসিসা বুঝতে পারেনি যে, এটা শয়তানের কুমন্ত্রণা। মানুষের প্রতি দরদের কারণে মেয়েটিকে সে সাহায্য করতে রাজি হলো। মেয়েটিকে একটি ঘরে থাকতে দিল সে। সে মেয়েটির জন্য খাবার রেখে আসত, মেয়েটি নিজে এসে খাবার নিয়ে যেত। বারসিসার সাথে তার দেখা হতো না।

শয়তান বারসিসার কাছে আবার আসলো এবং বলল, "তুমি মেয়েটির খাবার তার ঘরের সামনে রেখে আসলেই তো পারো। এর ফলে মেয়েটাকে ঘর থেকে কেউ এতটা পথ একা একা হেঁটে বের হতে বা ফিরে যেতে দেখবে না!"

বারসিসা রাজি হলো এবং মেয়েটির ঘরের সামনে খাবার রেখে আসতে শুরু করল। শয়তান এতেও খুশি না। সে আবার আসলো এবং কানে কানে বলল – " তার ঘরের ভেতরে খাবার দিয়ে আসলেই তো হয়। তাহলে মানুষ তাকে ঘর থেকে একা একা বের হতে আর ঢুকতে দেখত না!" এবার বারসিসা তার ঘরের মধ্যে

খাবার দিয়ে আসতে শুরু করল। শয়তান আবার আসলো এবং বলল – "মেয়েটার সাথে তোমার কথা বলা উচিত, এভাবে একা থাকলে তো সে পাগল হয়ে যাবে।" বারসিসা মেয়েটির কথা চিন্তা করে তার সাথে রুমের আড়ালে কথা বলতে শুরু করল।

শয়তানের কুমন্ত্রণায় এক সময় তারা একই রুমে কথা বলতে লাগল।

এভাবে শয়তান তার কাজের কঠিন অংশ বাস্তবায়িত করে। এই পর্যায়ে বারসিসা এবং মেয়েটা একে অপরের প্রতি দুর্বল হয়ে যায় এবং এক সময় ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। একটি বাচ্চা জন্ম দিল মেয়েটি। বাচ্চা জন্মের সময় শয়তান বারসিসার কাছে আবার এসে বলল, "এটা তুমি কী করলে? তোমার পাপের প্রমাণ সরিয়ে ফেল, না হলে মেয়েটির ভাইরা ফিরে আসলে তোমাকে খুন করবে!"

বারসিসা বাচ্চাটিকে খুন করল এবং ঐ ঘরের মেঝেতে পুঁতে ফেলল।

শয়তান এবার বলল, "তুমি এক নারীর সন্তান হত্যা করেছ এবং আশা করছ যে সে এটা কাউকে বলবে না?"

তখন বারসিসা মেয়েটিকেও খুন করল এবং তাকেও ঐ ঘরের মেঝেতে পুঁতে রাখল। মেয়েটির ভাইরা ফিরে আসলে তাদেরকে একটা মিথ্যা কবর দেখিয়ে বলল "তোমাদের বোন অসুখে মারা গিয়েছে এবং ঐ কবরে দাফন করা হয়েছে।" তারা বারসিসার কথা বিশ্বাস করল।

সেই রাতে শয়তান তিন ভাইকে একই স্বপ্ন দেখাল যে "বারসিসা তোমাদের বোনকে হত্যা করেছে। প্রমাণ হিসাবে তোমাদের বোন যে ঘরে থাকত, তার মেঝে খুঁড়ে দেখতে পারো।" ঘুম ভাঙলে তারা একে অপরকে স্বপ্নের কথা বলল এবং বুঝতে পারল তারা তিনজন একই স্বপ্ন দেখেছে। যাচাই করার জন্য বারসিসার এলাকায় যেয়ে প্রথমে বারসিসার দেখানো কবর খুঁড়ল তারা। দেখল কিছু নেই। এর পর যে ঘরে তাদের বোন থাকত, তারা ঐ ঘরের মেঝে খুঁড়ে তাদের বোনের এবং বাচ্চার লাশ পেল। তারা বারসিসাকে ধরল এবং বলতে বাধ্য করলো আসলে কী হয়েছিল।

তারপর তারা তাকে রাজার কাছে নিয়ে গেলে রাজা তাকে শিরশ্ছেদ করতে আদেশ দেয়। যখন বারসিসাকে মৃত্যুদণ্ড দিতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তখন শয়তান আবার কাছে আসল। এবার ওয়াসওয়াসা না, মানুষের রূপ নিয়ে আসল সে। এসে বলল, "শুনো বারসিসা, আমি হলাম শয়তান। তোমার এই অবস্থা তোমার নিজের

চিন্তায় হয়নি, আমিই করেছি। আর একমাত্র আমিই তোমাকে বাঁচাতে পারি, যদি তুমি আমার কথা মেনে চল।" বারসিসা বলল, "আমাকে কী করতে হবে?"

শয়তান বলল, "আমাকে সেজদা কর। আমি তোমাকে রক্ষা করবো।" বাঁচার জন্য মরিয়া হয়ে বারসিসা শয়তানকে সিজদা করল এবং কাফের হয়ে গেল। সিজদা করার সাথে সাথে শয়তান তাকে বলল – "আমি এখন তোমার থেকে মুক্ত। আমি আল্লাহকে ভয় করি, যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক।" এই বলে শয়তান সেখান থেকে পালালো এবং বারসিসার শিরশ্ছেদ করা হলো। কেয়ামতের দিন বারসিসাকে যখন জীবিত করা হবে, তখন সে শয়তানকে সিজদা করতে করতে উঠে দাঁড়াবে!

শয়তানের কৌশলের দিকে খেয়াল করুন। কীভাবে বারসিসাকে ফাঁদে ফেলেছে। সে আপাতঃদৃষ্টিতে ভালো কাজে উৎসাহ দিত। কিন্তু আসলে সে ছিলো সবচেয়ে বড় শত্রু! সে ধীরে ধীরে তাকে গুনাহের দিকে নিয়ে গেছে এবং শেষ পর্যন্ত তাকে আল্লাহর সাথে শির্ক করিয়ে ছেড়েছে। এটাতেই আমাদের জন্য অনেক শিক্ষা আছে।

খেয়াল করুন, একটা মানুষ কি হুট করেই পর্নোগ্রাফির নেশায় আসক্ত হয়? না। ধীরে ধীরে স্টেপ বাই স্টেপ আসক্ত হয়।

প্রথমত আমরা আমাদের চোখকে নিচে নামাই না। নজরের হেফাজত করি না। যেদিকে খুশি, সেদিকে তাকাই। সেখান থেকে আমাদের অন্তরে খারাপ আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয়। তারপর আমরা সেগুলো নিয়ে মনের মধ্যে ভাবতে থাকি। ওয়াসওয়াসা কে বাধা দিই না। তারপর যখন মনের ভিতর কোনোকিছুর ট্রিগার আসে, তখন সেটাকে নিয়ে অনলাইনে সার্চ করি। তখন পর্যন্ত আমরা ভাবি, "আমি তো শুধু ছবিটাই দেখবো।"

তারপর সেই ইমেজ সার্চ করতে করতে তার চেয়ে অনেক খারাপ কিছু সামনে চলে আসে। সে সময় শয়তান ওয়াসওয়াসা দেয় আরেকটু দেখলে কোনো ক্ষতি হবে না। তারপর সেটা বাড়তে বাড়তে পর্নের দিকে চলে যায়। তারপর সেটা তার অভ্যাস হয়ে যায়। শয়তান তখন ওয়াসওয়াসা দেয় "এটা তো কোনো গুনাহ না", "এখনকার সময় এগুলো তো সবাই দেখে", "বিয়ের আগে একটু দেখলে ক্ষতি কী", "এটা তো এখন তোমার নেশা হয়ে গেছে।"

তখন মানুষ পর্নোগ্রাফির নেশা থেকে নিজেকে বাধা দেওয়ার কোনো চেষ্টা করো না। ডিমোটিভেটেড হয়ে যায়। কারণ শয়তান তার মনে ঢুকিয়ে দেয়, "তুমি তো এখানে আটকে গেছো। এখন তো তোমার এটা দেখা লাগবেই।"

আমি অনেক তরুণ-যুবককে চিনি, যারা কলেজ ইউনিভার্সিটিতে গিয়েছে একেবারে ভালো পরিবারের সন্তান হিসেবে। নিয়মিত নামাজ পড়ে। নিজের চোখের হেফাজতও করে। তারাও পর্নোগ্রাফির নেশায় আসক্ত হয়ে গেছে। "মিউজিক্যাল কনসার্টে গেলে কিছু হয় না, অপজিট জেন্ডারের সাথে কথা বললে, হ্যান্ডশেক করলে কিছু হয় না। হুজুররা কিছু জানে না। তারা শুধু শুধু সকল বিনোদনের বিরুদ্ধে বলে।" এভাবে আস্তে আস্তে তারা গুনাহের দিকে চলে যায় এবং হারাম রিলেশনশিপে জড়িয়ে যায়। সেখান থেকে চ্যাটিং, এরপর খারাপ কথাবার্তা, খারাপ ভিডিওর আদান-প্রদান। তারপর কালক্রমে শারীরিক সম্পর্ক।

আমরা অবাক হয়ে যাই যখন আমরা নিজেদেরকে জ্ঞান বুদ্ধিসম্পন্ন ভাবি। নিজেদের শিক্ষিত ভাবি। কিন্তু যখন শয়তান এবং শয়তানের ফাঁদ চেনার ব্যাপার আসে, তখন না জানি আমাদের বিবেক, বুদ্ধি কোথায় থাকে! আর এটা কমবেশি আমাদের সবার সাথে হয়। শয়তান প্রত্যেক মানুষকেই আক্রমণ করার উপায় জানে। প্রত্যেক মানুষকে গোমরাহ করার উপায় সে জানে। কাউকে সে আর্থিক সমস্যা নিয়ে ওয়াসওয়াসা দিবে, কাউকে বিয়ে সংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে ধরবে। সে আমাদের সকলেরই দুর্বলতা জানে। আমরা কিসে ভয় পাই, সেটাও জানে সে। আর শয়তান প্রত্যেকের জন্য সে অনুযায়ী পরিকল্পনা করে।

এছাড়া শয়তান অলসতা এবং হতাশার মাধ্যমেও মানুষকে ডাউন বা ডিমোটিভেট করে। যাতে আমাদের ইবাদাতে বিঘ্ন ঘটে, আল্লাহর সাথে আমাদের সম্পর্ক যাতে নষ্ট হয়। আমরা যাতে আমাদের দৈনন্দিন কাজগুলো ঠিকমতো না করতে পারি। যেমন অনেক সময় শয়তান আমাদের মধ্যে এতটাই অলসতা জাগিয়ে দেয়, যাতে আমরা অজু করে নামাজ না পড়ি, মসজিদে যাতে না যাই এবং আমাদেরকে এমন এমন সব কাজে ব্যস্ত রাখে, যেগুলো এত গুরুত্ব বহন করে না। কিন্তু যখন নামাজ বা ইবাদাতের সময় আসে, তখন আমরা অলস হয়ে যাই। যে বান্দার আল্লাহর ইবাদাত করার কোনো এনার্জি থাকে না, তাহলে তার এনার্জি থেকেও বা লাভ কী? দুনিয়ার বাকি সব কাজ করতে কোনো সমস্যা হয় না, কিন্তু নামাজ বা ইবাদাত করতে গেলেই অলসতা চলে আসে – এটাই হচ্ছে শয়তানের ধোঁকা।

আবার আরেকটি বিষয় হচ্ছে মুড অফ বা মন খারাপ করে থাকা। শয়তান ছোট ছোট কথায় আপনাকে হতাশ করায়, বার বার চিন্তা করায়। নেগেটিভিটিগুলো জমা করে আপনার সামনে নিয়ে আসে।

-দেখো, অমুকে তোমাকে এটা বলেছে।

-তোমার স্বামী/স্ত্রী/শাশুড়ী তোমাকে এটা বলেছে।

-তোমার ওই বন্ধু তোমার সম্পর্কে এটা বলেছে।

-ফেসবুকে তোমার পোস্টে এই কমেন্ট করেছে।

এই সব ছোটখাট বিষয়ে নেগেটিভ চিন্তাভাবনা মাথায় ঢুকায় এবং মাথার মধ্যে এমন সিচুয়েশন তৈরি করে, যেটা আসলে হয়নি বা হবার সম্ভাবনা নেই। সেগুলো নিয়েই শয়তান বারবার বসে চিন্তা ভাবনা করায়, ওয়াসওয়াসা দেয়। শয়তান আপনাকে এতটাই হতাশ করে দেয়, যাতে আপনি মন খারাপ করে বসে থাকেন। যাতে সারা দিন আপনার নষ্ট হয়। আপনার এনার্জি ডাউন হয়ে যায়, ইবাদাত করতে মন বসে না এবং কোনো দোয়া করতে ইচ্ছা করে না। তাছাড়া আপনার সাথে আশেপাশের লোকজন যেমন আপনার স্বামী, স্ত্রী/ বন্ধুবান্ধব আপনার এই ডাউন বা মুড অফ থাকার কারণে তারা আক্রান্ত হয় বেশি।

তাই সচেতন হোন। নিজেকে মনে করিয়ে দিতে থাকুন যে, আপনার সুরক্ষা দরকার। আল্লাহ তা'আলা কামনা-বাসনা ও আকাঙ্ক্ষার ব্যাপারে মানুষকে দুর্বল করে সৃষ্টি করেছেন। এটাই মানুষের জন্য পরীক্ষা। কিন্তু যে মানুষ এই কামনা-বাসনা ও আকাঙ্ক্ষা থাকা সত্ত্বেও নিজেকে বাধা দিতে পারে, তখন তার মর্যাদা ফেরেশতাদের সমান বা তার উপরে চলে যায়। এটাই হচ্ছে আসল কথা।

হ্যাঁ, আমি আপনাদেরকে ভয় পাইয়ে দিচ্ছি এবং শয়তানকে ভয় পাওয়াই উচিত। কিন্তু এটার উদ্দেশ্য আপনাকে ডিমোটিভেটেড করা নয়, সতর্ক করা। শয়তানের সাথে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত থাকুন। ইনশাআল্লাহ আপনি পারবেন। যেটা আপনার প্রয়োজন, সেটা হচ্ছে আত্মবিশ্বাস। আপনি একজন মানুষ আর আল্লাহ তা'আলা আপনার মধ্যে সে সক্ষমতা দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলার সাহায্য নিয়ে সবকিছু আপনার জন্য সহজ হয়ে যাবে। আপনাকে পরীক্ষা করা হবে এবং আল্লাহ অবশ্যই আপনাকে সাহায্য করবেন। কিন্তু সেই সাথে সতর্ক থাকতে হবে। এটাই হচ্ছে আসল কথা।

শয়তান মানুষকে গোমরাহ করার পিছনে লেগেই আছে। তো এখন আমাদের ভূমিকাটা কী হবে? আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে ইসলাম দিয়েছেন, হিদায়াত দিয়েছেন, বিবেক বুদ্ধি দিয়েছেন। আর যারা এই লেখাটি পড়ছেন, আমাদের সবাইকে মুসলমান হিসেবে বানিয়েছেন। বিশেষ করে তরুণদের উদ্দেশ্য করে বলছি, দয়া করে শয়তানের ফাঁদে পা দিবেন না। শয়তানের মেকানিজম থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করুন। নিজেকে ধ্বংসের পথে ফেলে দেবেন না। শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করবেন না। আল্লাহর রাসূল যে কথাগুলো বলেছেন, সেগুলো অনুসরণ করুন। এটাকে সিরিয়াসলি নিন। কারণ শয়তান অনেক বড় বড় আলেমকে গোমরাহ করেছে। আমাদের জন্য সামনে অনেক বিপদ আছে, যদি আমরা এই বিষয়টি উপলব্ধি করতে না পারি। আল্লাহ তা'আলা আপনার সাথে থাকলে কোনো কিছুই আপনার জন্য কঠিন হবে না। তাই শয়তানের ধোঁকা ও ফেতনা থেকে বাঁচতে আল্লাহর কাছে দোয়া, ইসতেগফার ও অন্যান্য আমল করতে থাকুন। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে শয়তানের আক্রমণ থেকে বেঁচে থাকার তৌফিক দান করুক।

পেয়ার, ইশক ঔর মোহাব্বাত

প্রেম-ভালোবাসা মানুষের মজ্জাগত স্বভাব। কিশোর-তরুণ-যুবসমাজ চিরকালই সকল মানবসমাজে কিছু না কিছুমাত্রায় বিবাহ-পূর্ববর্তী প্রেমে লিপ্ত হয়েছে। কিন্তু কোনোকিছুর অস্তিত্ব থাকা মানেই সেটার বৈধতার প্রমাণ নয়। আর মাপকাঠি যদি হয় ইসলামের বর্ণিত হালাল-হারাম, তাহলে তো কথাই নেই।

ইমাম ইবনুল কাইয়িম রহিমাহুল্লাহ তো একে অন্তরের রোগ হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। কারণ মানুষ যখন এতে আক্রান্ত হয়, তখন বিশেষ একটি পর্যায়ে যেন সে নিজেকে নিজেই ভুলে যায়। আশেপাশের লোকদেরকে তো বটেই। তার মাঝে আপনি যতই সেন্স দেওয়ার বা বোঝানোর চেষ্টা করেন, সে কিছুই বুঝতে পারে না। তাই এই ধরনের রোগে যারা আক্রান্ত হয়, তাদেরকে কাউন্সেলিং করাটাও অনেক সময় কঠিন হয়ে যায়।

বর্তমান যুগের অজ্ঞরা ভাবে বিয়ে স্রেফ একটা কাগজের টুকরো। প্রেম যেখানে প্রাকৃতিক, বিয়ে সেখানে রাষ্ট্র নামক কৃত্রিম একটি প্রতিষ্ঠানের কাছে কাগজে সাইন করে নিজেদের "স্বর্গীয়" প্রেমকে নথিভুক্ত করে রাখা মাত্র। কিন্তু মানবজাতির সেই সূচনালগ্ন থেকে প্রতিটি মানবগোষ্ঠীতে কোনো না কোনোরূপে বিয়ে নামক প্রতিষ্ঠানটি ছিল এবং আছে। এটা অকারণে নয়। সমাজ বা রাষ্ট্রের কাছে জানিয়ে শুনিয়ে দুটো মানুষ এক হওয়া মানে ব্যক্তির স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন নিশ্চিত হওয়ার পাশাপাশি গোটা মানবসমাজের স্থিতিশীলতা রক্ষা পাওয়া। নারী-পুরুষের অনিয়ন্ত্রিত, খামখেয়ালি, দায়বদ্ধতাহীন মেলামেশাই বরং মানবপ্রকৃতি থেকে জীবপ্রকৃতি পর্যন্ত সবকিছুতে বিশৃঙ্খলা বয়ে আনে।

আধুনিককালে এই বিশৃঙ্খলা আরো সহজ হয়ে গিয়েছে। প্রথমত, এখনকার পৃথিবীতে নারী ও পুরুষের সর্বত্র সহাবস্থানকে স্বাভাবিক করে দেওয়া হয়েছে। তাদের আলাদা করতে চাওয়ার যেকোনো প্রচেষ্টাকে দেখা হয় সেকেলে,

ধর্মান্ধতাপূর্ণ, সন্ত্রাসমূলক কার্যক্রম হিসেবে। দ্বিতীয়ত, সেই সহাবস্থান থেকে কারো প্রতি কারো ভালোলাগা চলে এলে সেটাকে ওই বিশৃঙ্খলার দিকে টেনে নিয়ে যাওয়ার জন্য রয়েছে হাজারো উস্কানিদাতা মাধ্যম। টুথপেস্টের বিজ্ঞাপন থেকে বলিউডের গান পর্যন্ত সবখান থেকে চেঁচিয়ে উৎসাহ দেওয়া হতে থাকে, যেন এই অপরিপক্ক ছেলেমেয়েগুলো আরো এগোতে এগোতে অতল খাদে গিয়ে উলটে পড়ে যায়। তৃতীয়ত, প্রযুক্তির সহজলভ্যতার কারণে বিবাহ-পূর্ববর্তী হারাম প্রেমের উদ্দেশ্যে দুটো ছেলে ও মেয়ে পারস্পরিক যোগাযোগ করতে পারছে আরো সহজে, কল্যাণকামী অভিভাবকদের চোখ এড়িয়ে।

বিবাহ-পূর্ববর্তী সম্পর্কের ফল

- নিজের গ্রোথ এবং পড়াশোনা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া। অনেকেই নিজের ক্যারিয়ার ধ্বংস করে দেয় প্রেমের পেছনে ছুটতে গিয়ে।

- সবসময় মানসিক চাপের মধ্যে থাকা। প্রেমালাপ হোক, বা ঝগড়া – সবসময়ই কিছু না কিছু নিয়ে চিন্তায় ব্যস্ত থাকতে হবে আপনাকে।

- আল্লাহর ইবাদাত করতে ইচ্ছা করে না। এটাই সবচেয়ে বড় সমস্যা। ইবাদাত করতে কোনো আগ্রহ থাকে না। কারণ সবসময় আপনি আরেকজনকে নিয়েই সারাদিন চিন্তা করেন।

- প্রেমিক-প্রেমিকার সম্পর্ক যদি বিয়ে (বা যেই সমাজে 'কমিটমেন্টে'র যেরকম রূপরেখা প্রচলিত) পর্যন্ত গড়ায়ও, দাম্পত্যজীবনের স্পার্ক খুব সহজেই চলে যায়। কারণ তারা তো আগেই সব সীমারেখা ছাড়িয়ে গেছে। তাছাড়া সেসময় একে অপরের সামনে সাধ্যমতো নিজের সেরা রূপটা দেখিয়েছে। কিন্তু মানুষ তো গোটা জীবনের প্রতিটা মুহূর্ত তার সেরা ফর্মে থাকে না। এটাই মানুষের বাস্তবতা। তাই বিয়ের পর নতুন করে আর কিছু করারও থাকে না, আবার আগের সেই রূপে-গুণে-স্মার্টনেসে অনন্য মানুষটির সাথে বর্তমানের ভালো-মন্দের মিশেলে গড়া মানুষটির কোনো মিলও খুঁজে পাওয়া যায় না।

প্রেমে পড়াটা কি আমাদের নিজের নিয়ন্ত্রণে থাকে?

আমাদের সবারই কমন অনুযোগ, "প্রেম-ভালোবাসা কেউ ইচ্ছে করে করে না, এটা আপনা-আপনিই হয়ে যায়।" প্রেমে পড়াটা আমাদের নিয়ন্ত্রণে থাকে কি না, এই ব্যাপারে ইমাম ইবনুল কাইয়িম রহিমাহুল্লাহ বলেছেন:

> "কারোর দিকে আকর্ষিত হওয়ার প্রাথমিক ধাপগুলো নিজের নিয়ন্ত্রণেই থাকে এবং সেগুলো এড়িয়ে চলা প্রয়োজন। কারো দিকে তাকানো, তাকে নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা এবং ঐসব জায়গায় যাওয়া যেখানে প্রেমে পড়ার সুযোগ থাকে ইত্যাদি। কিন্তু কেউ যদি এই পদক্ষেপগুলো নেয়, তাহলে সেটার ফলে এমন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, যা তখন আর তার নিজের নিয়ন্ত্রণে থাকে না।"

এ ব্যাপারে একটা হাদীস বর্ণনা করা যায়।

ফুজাইল ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি আরাফার দিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পেছনে ছিলাম। সেখানে এক যুবক নারীদের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন তার চেহারা ঘুরিয়ে দিলেন। তাকে বলেন,

> "হে ছেলে, এটি এমন এক দিন, এই দিনে যারা দৃষ্টি অবনত রাখবে, মুখ এবং লজ্জাস্থান হেফাজত করবে, আল্লাহ তা'আলা তাদের ক্ষমা করে দেবেন।"[১৫]

তাই এমন সব জায়গায় যাওয়া ঠিক না, যেখানে এই ধরনের অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়। আবার কোথাও যাওয়া ছাড়া জায়গায় বসেই হারামের উস্কানিদাতা মিউজিক শোনার ফলেও আপনি হতে পারেন একই ফাঁদের শিকার। এসব শোনা বা না-শোনা কিন্তু আপনার নিজের নিয়ন্ত্রণেই আছে।

তাই ইমাম ইবনুল কাইয়িম রহিমাহুল্লাহ এটাই বলেছেন যে, যখন আপনি এগুলোর মধ্যে ফেঁসে যাবেন, তখন আপনার নিজের উপরে নিজের নিয়ন্ত্রণ থাকবে না। তাই সব সময় দৃষ্টিকে অবনত রাখুন। যে আপনার জন্য ফিতনার কারণ হয়, তাকে দেখা ছেড়ে দিন। তার সাথে ইন্টার‍্যাকশন করাই ছেড়ে দিন।

---

[১৫] মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ৩০৪২

সাইকোলজি অফ লাভ

আমেরিকার কর্নেল ইউনিভার্সটির হিউম্যান ডেভেলপমেন্টের প্রফেসর ও সাইকোলজিস্ট Robert J. Sternberg এর ভালোবাসার উপরে একটা বিখ্যাত থিওরি আছে, যেটা *Triangular theory of love* নামে সর্বাধিক পরিচিত। এই তত্ত্ব আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্কের মধ্যে প্রেমের বিষয়টি ব্যাখ্যা করে। *Passion, Intimacy and Commitment* তিনটি উপাদানের উপর ভিত্তি করে সাইকোলজিস্ট Robert J. Sternberg ভালোবাসার বিভিন্ন অবস্থা ব্যাখ্যা করেছেন। এই তিনটি উপাদানের বিভিন্ন সংমিশ্রণে প্রেমের বিভিন্ন ধাপ এবং প্রেমের বিভিন্ন ধরন ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

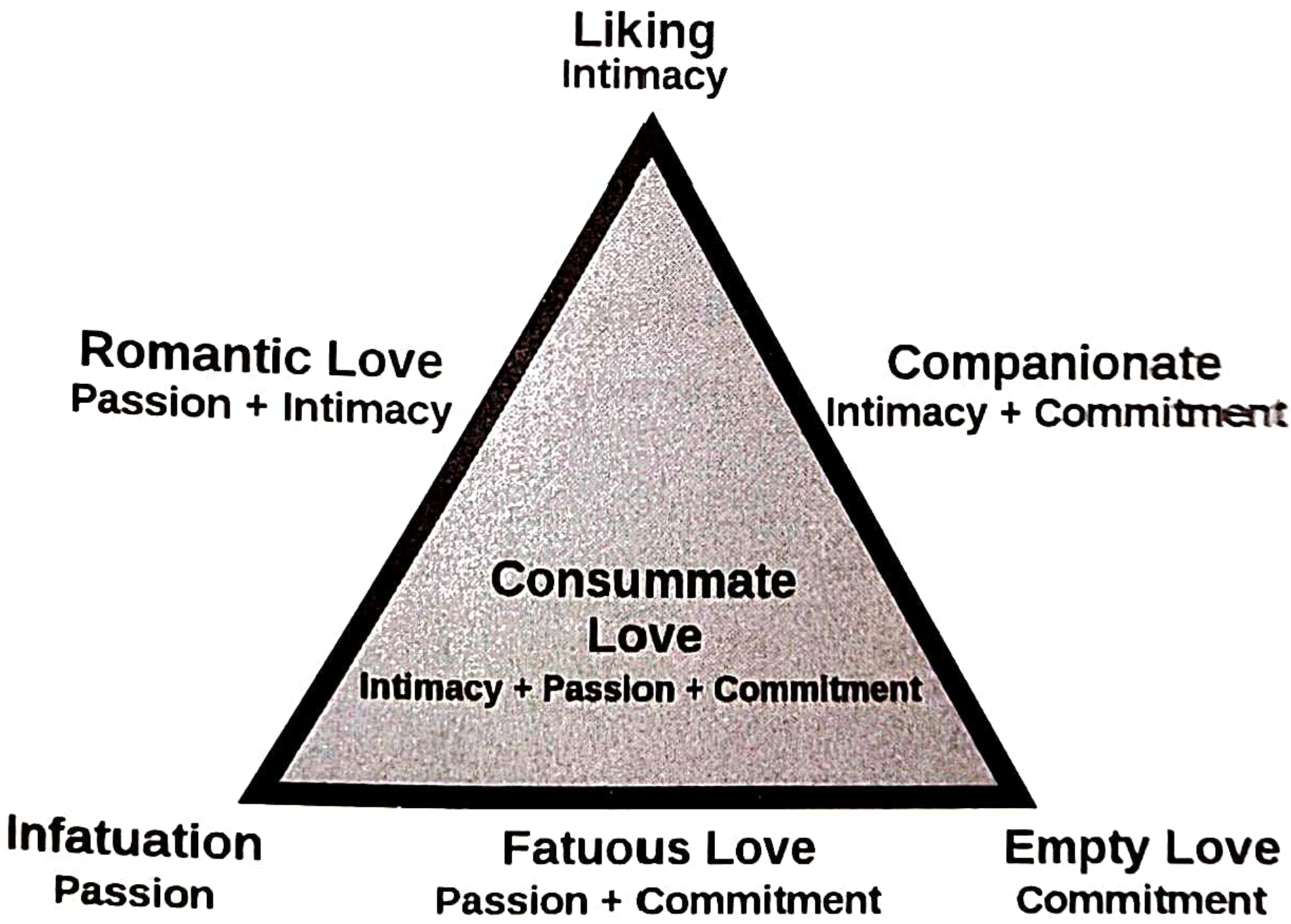

Passion (আবেগ): ভালোবাসা প্যাশন থেকে শুরু হয়। আপনি যখন কাউকে পছন্দ করা শুরু করেন, তার সাথে কথা বলার শুরু করেন, তখন আপনার ডোপামিন নিঃসরণ শুরু হয়। মনে হয় যেন আপনি স্বর্গে আছেন। নিজেকে মনে হয় পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী মানুষ । আপনার চারদিকে প্রজাপতি আর ফুল উড়ছে।

Intimacy (ঘনিষ্ঠতা): প্যাশনের পরবর্তী ধাপ হচ্ছে ঘনিষ্ঠতা। এ পর্যায়ে আবেগ কিছুটা কম হয়। এটাকে একে অপরের প্রতি আন্তরিকতার অনুভূতি হিসাবে বর্ণনা করা হয়। এটি সেই দুজনের মধ্যে বন্ধনকে শক্তিশালী করে। এছাড়া এই ঘনিষ্ঠতা একে অপরের সাথে স্বাচ্ছন্দ্যের বোধ তৈরি করতে সহায়তা করে।

Commitment (প্রতিশ্রুতিবদ্ধতা): তারপরের ধাপ হচ্ছে কমিটমেন্ট। এখানে আপনি আবেগ এবং ঘনিষ্ঠতা থেকে অতিক্রম করে সিদ্ধান্ত নেন যে, আমি অমুকের সাথেই সারা জীবন থাকব। তার সাথেই আপনি কমিটেড থাকেন। সেই প্রতিশ্রুতির আনুষ্ঠানিক রূপটাকেই আমরা বলি বিয়ে। এবার বুঝলেন তো বিয়ে যে স্রেফ সরকারকে দেখানোর জন্য কোনো কাগজের টুকরো নয়?

এই তিনটি উপাদানের উপর ভিত্তি করে ভালোবাসার আটটি ধরন পাওয়া যায়।

Combinations of intimacy, passion, commitment

	Intimacy	Passion	Commitment
Non-love			
Liking/friendship	X		
Infatuated love		X	
Empty love			X
Romantic love	X	X	
Companionate love	X		X
Fatuous love		X	X
Consummate love	X	X	X

উপরের ছবি থেকে আমরা দেখতে পাই, Consummate love হচ্ছে ভালোবাসার আদর্শ রুপ যেখানে Passion, Intimacy এবং Commitment তিনটিই উপস্থিত থাকে । তবে Sternberg এও বলেছেন যে, এই অন্তরঙ্গ ভালোবাসা বজায় রাখা, এটি অর্জনের চেয়েও কঠিন হতে পারে। কারণ Consummate love সব সময় স্থায়ী থাকে না। যদি প্যাশন সময়ের সাথে হারিয়ে যায়, তখন এটি companionate love এ পরিণত হয়।

companionate love সাধারণত বিবাহের পরে একসাথে অনেকদিন থাকার পরেই পাওয়া যায়। যখন আপনি কোনো যৌন বা শারীরিক আকাঙ্ক্ষা ছাড়াই কারো সাথে এমন এক ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে তুলেন যার মাধ্যমে লাইফের সব কিছু শেয়ার করেন। একে অপরের উপর কমিটেড থাকার কারণে এই ভালোবাসা বন্ধুত্বের চেয়েও শক্তিশালী হয়। যেহেতু আপনারা একে অপরের সঙ্গী, তাই অপরের খারাপ দিকগুলো আপনি সহজেই ইগনোর করতে পারেন। একে অপরকে গাইড করতে পারেন। এটাকেই তো জীবন সঙ্গী বলে।

বিয়ের আগে সত্যিকারের ভালোবাসা সম্পর্কে জানা যায় না। কারণ তখনো তো আপনি কমিটমেন্ট বা কম্প্যানিয়নশিপের কিছুই দেখেননি।

এটাই হচ্ছে ভালোবাসার পিছনের পুরো সাইকোলজি।

ইসলামের দৃষ্টিতে প্রেম-ভালোবাসা

ভালোবাসা ও সহানুভূতি বোঝাতে কুরআনে যে দুইটি শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, সেগুলো হচ্ছে مَوَدَّةً (মাওয়াদ্দাহ) ও وَرَحْمَةً (ওয়াররাহমা) । আল্লাহ তা'আলা সূরাহ রুমের, ২১ নম্বর আয়াতে বলেছেন,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের থেকেই স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি পাও। আর তিনি তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এর মধ্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে সে চিন্তাশীল জাতির জন্য।"

এটাই হচ্ছে ভালোবাসার ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি। ভালোবাসা সেটাই, যেটা আপনাকে প্রশান্তি দেয়। প্রেম-ভালোবাসা আসলে ওইটা না, যেটা আপনাকে সবসময় অস্থির রাখে। মনে হয় আপনি ভেতর থেকে ক্লান্ত হয়ে আছেন, অন্তরে শান্তি পাচ্ছেন না। প্রেম-ভালোবাসার প্রধান শর্তই হচ্ছে আপনারা একে অপর থেকে প্রশান্তি লাভ করবেন এবং সেটা একমাত্র হালাল পন্থায়ই সম্ভব হয়, অর্থাৎ বিয়ে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি হাদীসে বলেছেন —

"দুজনের পারস্পরিক ভালোবাসার জন্য বিয়ের চেয়ে উত্তম আর কিছু নেই।"[১৬]

তারপর অবশ্যই আল্লাহ আপনার অন্তরে মাওয়াদ্দাহ ও রাহমা দিয়ে ভরে দেবেন। মাওয়াদ্দাহ মানে হচ্ছে আনকন্ডিশনাল ভালোবাসা। ভালোবাসা অবশ্যই হবে শর্তহীন। এমন না যে সঙ্গীর যতদিন পর্যন্ত সুন্দর চেহারা থাকবে বা টাকা-পয়সা থাকবে, ততদিন পর্যন্ত ভালোবাসা থাকবে। আর তারপর যখন অবস্থা কিছুটা খারাপ হবে, তখন আর ভালোবাসা থাকবে না।

খেয়াল করেছেন কি? এই মাওয়াদ্দা, রাহমা আর প্রশান্তির সমষ্টিই কিন্তু একটু আগে আলোচিত সেই compassionate love.

ছেলে-মেয়ের একে অপরের প্রতি প্রেম-ভালোবাসার অনুভূতিকে ইসলাম অস্বীকার করে না। কিন্তু ইসলাম সেটাকে হালাল তরিকায় পূর্ণ করতে বলে। যাতে আপনি নিজের উপর রহম করেন এবং অপরজনের উপরও রহম করেন। সেটা হলো বিয়ে করে ফেলা। তাই আপনার বয়স কম হলেও বিয়ের চেষ্টা করুন। আল্লাহ তা'আলা চাইলে হয়তো কম বয়সেই হয়ে যাবে।

কিন্তু এটাও খেয়াল রাখতে হবে যে, দুই পক্ষ পরস্পরের জন্য ফিট হবে কি না। কারণ বিয়ে করলেই যে তাতে প্রেমের অন্ধ আবেগ থাকবে না, তা না। হয়তো হালালভাবেই বিয়ে করে ফেলেছেন, কিন্তু বাস্তবতার নিরিখে বুঝেশুনে করার বদলে সাময়িক আবেগকে তাড়াহুড়া করে জাপটে ধরেছেন। এরপর দেখা গেল বনিবনা হচ্ছে না। এমনটি যেন না হয়।

দুই পরিবারের মাঝে সাংস্কৃতিক, সামাজিক, আর্থিক অবস্থার খুব বেশি পার্থক্য থাকলে আজীবনের জন্য মানিয়ে চলা আসলেই কষ্টকর হয়ে যায়। এটা কোনো

---

[১৬] ইবনে মাজাহ: ১৮৪৭

ইসলামবিরোধী আচরণ নয়, স্বাভাবিক মানবীয় বৈশিষ্ট্য। দ্বীনদারির পাশাপাশি রূপ, বংশ ও সম্পদের কথাও যে হাদীসে উল্লিখিত হয়েছে, তা এমনি এমনি নয়।

তাছাড়া সব মা-বাবারই তাদের সন্তানদের নিয়ে আলাদা চিন্তাভাবনা থাকে। আর তারা ঐসব সমস্যার ব্যাপারেও জানেন, যেগুলো আপনি হয়তো এখন চোখে দেখছেন না। তাই মা-বাবার সাথে পরামর্শ না করেই নির্দিষ্ট কাউকে বিয়ের জেদ করবেন না।

কিছু করণীয়

- নিজের মর্যাদা এবং চালচলন এমনভাবে বজায় রাখুন, যাতে কেউ আপনাকে হারাম সম্পর্ক বা কোনো ধরনের হারাম কাজেরই প্রস্তাব দেয়ার সাহস না পায়। কথাটি ছেলে-মেয়ে উভয়ের জন্য প্রযোজ্য। আপনার দেশে দ্বীনদার মানুষদের যে লেবাস, তা নিয়ে চলাফেরা করুন। তাহলে আপনাকে দেখে ওইসব খেয়াল কারো মাথায়ই আসবে না।

- কারো দিকে আকর্ষিত হওয়ার যে তিনটি কারণ বলা হলো (কারো দিকে তাকানো, তাকে নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করা, ঐসব জায়গায় যাওয়া), সেসব থেকে নিজেকে হেফাজত করুন।

-তাকদিরের উপর বিশ্বাস রাখুন। আমাদের ঈমান এরকম হওয়া উচিত যে, আমাদের তাকদিরে যেটা লেখা আছে সেটা অবশ্যই আমরা পাব। তাই তাৎক্ষণিক মজা পাওয়ার জন্য হারাম জিনিস থেকে বিরত থাকুন।

- জীবনের উদ্দেশ্যকে বারবার রিভাইস করুন। আপনার জীবনের উদ্দেশ্য এতটা ছোট নয় যে, আপনি একটা মানুষকে না পেলেই আপনার মূল্যবান জীবনটা অর্থহীন হয়ে যাবে। এতটা ছোট উদ্দেশ্য নিয়ে নিশ্চয় আল্লাহ আপানাকে দুনিয়াতে পাঠাননি। আপনার দুনিয়াতে আসার পিছনে অনেক বড় উদ্দেশ্য আছে এবং সেই উদ্দেশ্যকে বারবার রিভাইস করুন।

পাঠকের পাতা

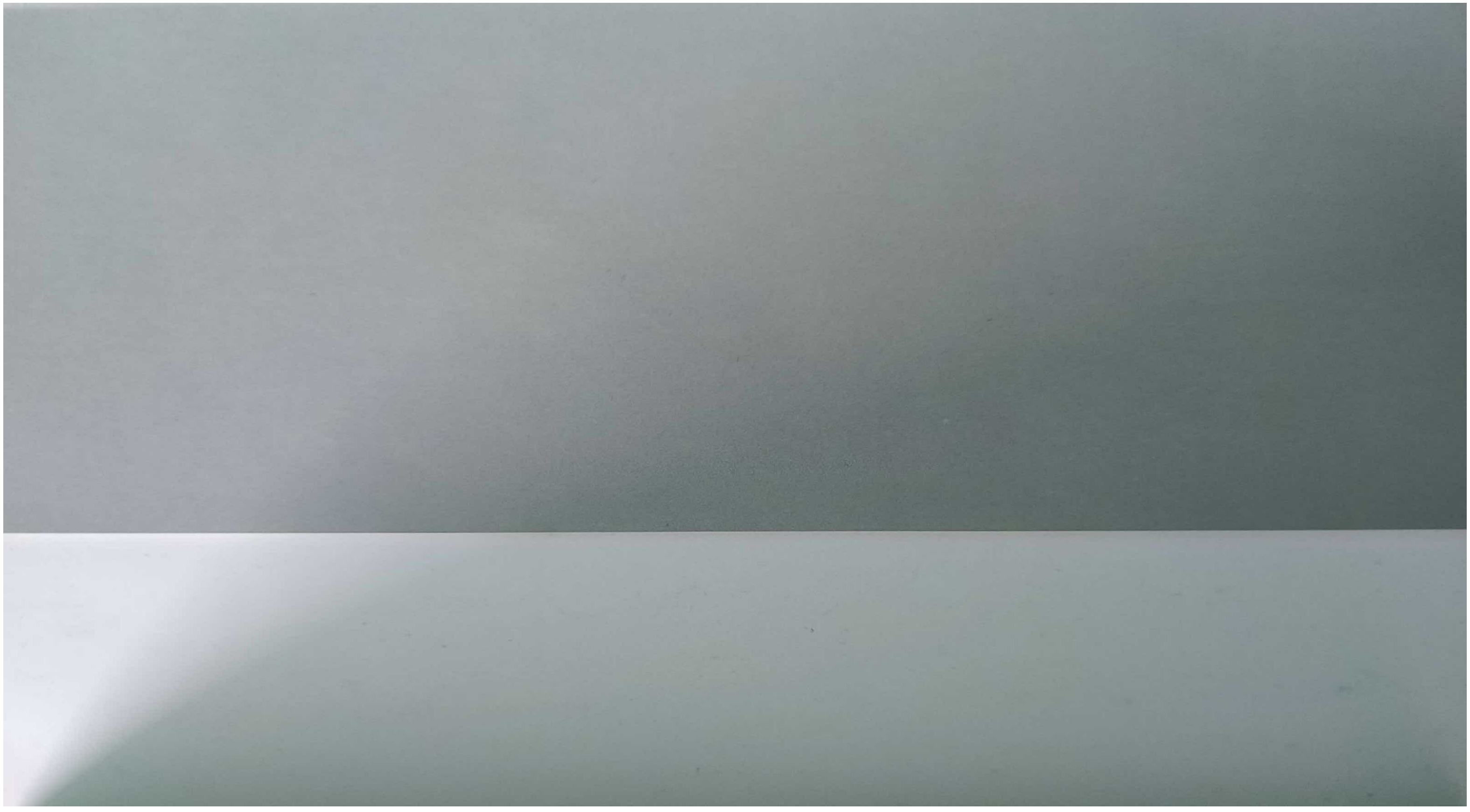

মন, অন্তর, আত্মা, নফস, রুহ, ক্বলব, mind, soul, psyche ... ... কী রহস্যে ঘেরা এক জগত, কতই না তার গলিঘুপচি! খান্নাস যখন নাস-কে ওয়াসওয়াসা দেয়, সেটাও দেয় তার 'সুদুর'-এ, বক্ষে, অন্তরে, মনে। সেই মন ও মনোজগৎকে বোঝার জন্য ফিজিক্স-কেমিস্ট্রি যথেষ্ট হয়নি। মানুষ গড়ে তুলেছে আলাদা শাস্ত্র – সাইকোলজি। কিন্তু আদৌ কি পাওয়া গেছে সবকিছুর উত্তর? পাওয়া সম্ভব?

এই বইটির অধ্যায়গুলো সেই মনকে ঘিরেই আবর্তিত। মনটার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, পরিশুদ্ধি, আবেগ, আসক্তি, অনুভূতি, রস, কষ এবং এর বন্ধু-শত্রুদের নিয়ে তুলে আনা হয়েছে টুকরো টুকরো কিছু ভাবনা। এগুলো কোনো উপসংহার নয়, বরং পাঠকের নিজের ভাবনাগুলোকে এগুলোর সাথে মিথস্ক্রিয়ায় আনার আহ্বান মাত্র। তাহলে শুরু করা যাক, চলুন!

9 789849 711506

BOOKMARK